
জানবার কথা
তিন



জানবার কথা

তৃতীয় খণ্ড

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাক্ষর
লি মি টে ড

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৩৭২, রসা রোড সাউথ, কলকাতা ৩৩ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী, বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিসার্স,
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা তুনিয়াকে জেনে তুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে



॥ ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র : ভূমিদাসদের কথা ॥

ভূমির দাসত্ব করে ওরা, তাই ওদের নাম হলো 'ভূমিদাস'। সে আবার কী? 'ভূমির দাসত্ব' মানে কী?

ব্যাপারটা বুঝিয়েই বলি —

আসলে এরা হলো চাষী। মধ্যযুগের ইউরোপের কথা বলছি, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত। সামন্ত-তন্ত্রের চরম বিকাশ ও চূড়ান্ত প্রতাপ এই যুগে। ইউরোপে কল-কারখানা মিল-ফ্যাক্টরি তখনও গজিয়ে ওঠেনি। ধনোৎ-পাদন বলতে মূলত চাষবাস। প্রতি দশটা লোকের মধ্যে হয়তো

নটা লোকই চাষী। কিন্তু যে-জমি এরা চাষ করে তার মালিক এরা কেউই নয়। ফলে—

ফলে, সারাটা জীবন যায় জমিদারের সেবা করতে।

জমিদারের সেবার মূল চেহারাটা হলো 'বেগার' খাটা। জমিদারের কাছ থেকে বন্দোবস্তি-নেওয়া জমি চষে খোরাকি জোটে, সংসার চলে। তাই, সপ্তাহের দু-তিন দিন বিনা মজুরিতে, বিনা খোরাকিতে, বেগার খেটে জমিদারের জমি চাষ করে দিয়ে আসতে হবে। তার ওপর আবার ফসল কাটা বা এই ধরনের সময়ে কাজের চাপ যখন বেশি পড়ে তখনই জমিদারের জমিতে গিয়ে বাড়তি 'বেগার' দিয়ে আসতে হয়। কার কাজ যে আগে তুলতে হবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। সবাই জানে যে চাষ করা, বীজ রোয়া, ফসল কাটা, এ-সব কাজ আগে সাঙ্গ হবে জমিদারের জমিতে,---চাষীর নিজের জমির পালা আসবে তার পরে।

তারপর ধরো, ঘরে এবার তোমার ফসল বেশি উঠেছে, কি মদ এবার বেশি তৈরি করেছো। বিক্রি করতে চাও? আগে খোঁজ নাও জমিদারের বাড়ি: তার ভাঁড়ারে বিক্রির জন্য বাড়তি জিনিস কিছু আছে নাকি। কারণ, ফসল, ফল-পাকুড়, মদ প্রভৃতি বিক্রির ব্যাপারেও জমিদারের জিনিসই আগে বিক্রি হবে, তবে অন্য মাল বেরোবে বাজারে।

আবার, চাষীর গম ভাঙাতে, রুটি বানাতে বা মদ চোলাই করতে হলে তাকে যেতে হবে জমিদারের কলে, চুল্লিতে বা চোলাইখানায়। প্রত্যেকটি কাজের জন্যেই হুজুরকে পুরো দাম মিটিয়ে দিতে হবে। মনে রেখো, জমিদারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া

চাষীর অন্য কোনো গতি ছিলো না। কারণ, অন্য কারুর কাছ থেকে এ কাজ করিয়ে নেবার তার না ছিলো অনুমতি, না ছিলো অধিকার নিজের ঘরে কল, চুল্লি বা ভাঁটি বসাবার।

এ ছাড়াও ছিলো নানা ধরনের করভার। চাষীর ফসল, গোরু-ভেড়া হাঁস-মুরগি, মৌচাকের মোম, সব কিছুর ওপরই কর বসানো চলতো। আর, করের পরিমাণ নির্ভর করতো জমিদারের মর্জির ওপর। এমনকি, কোনো চাষী মারা গেলে তার ছেলে বা বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের ওয়ারিশি সাব্যস্ত করার জন্য নজরানা আদায় করে নেওয়া হতো। আর সাধারণত চাষীর ঘরের সেরা গোরু, ভেড়া বা মুরগি 'নজরানা' বলে এই সময়ে কেড়ে রাখা হতো।

এক কথায়, চাষীরা চষতো জমি, আর সেই চাষীদের পেষাই করে সবটুকু রস নিঙড়ে নিতো জমিদার-প্রভুরা। আর এই ভূমিদাস-চাষীদের পরিশ্রম দিয়ে তৈরি হতো দেশের জমিদার-আমীর-ওমরাহ, ডিউক-ব্যারন-কাউন্টদের ঐশ্বর্য-সম্পদ; কাজে-কাজেই তারা এমন আইনই বানিয়েছিলো যে ভূমিদাসের জমি ছেড়ে নড়বার উপায় ছিলো না। শক্ত শিকলে তারা ছিলো বাঁধা।

ভূমিদাস যদি জমি ছেড়ে পালায় তবে তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসে কঠিন শাস্তি দেবার অধিকার জমিদারের ছিলো। আগে জমিদারের অনুমতি না নিয়ে সে জমি বিক্রি করতে পারতো না। শুধু তাই নয়, পাছে প্রভুর সেবকের অভাব ঘটে তাই বিয়ের ব্যাপারেও ছিলো ভয়ানক কড়াকড়ি। কোনো চাষী-প্রজার ঘরের ছেলেমেয়েকে জমিদারের এলাকার বাইরে বিয়ে করতে

হলে তাকে হুজুরের হুকুম নিয়ে রাখতে হতো।

বিচার? হ্যাঁ, তা ছিলো বৈ কি! তবে, বিচারশালা ছিলো জমিদারের কাছারি আর বিচারক জমিদার স্বয়ং, অথবা তার কোনো আমলা-গোমস্তা। এ ক্ষেত্রে জমিদার আর প্রজায় বিরোধ বাধলে বিচার যা হতো তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে, প্রজায়-প্রজায় ঝগড়া লাগলে, তখন প্রথা ও বিধি অনুযায়ী বিচারচলতো অবশ্যই।

এ কথা ঠিকই যে, মধ্যযুগের চাষের প্রণালী ছিলো খুবই পেছিয়ে-পড়া, অনুন্নত। কিন্তু তবু দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, হাহাকারের আসল কারণ ছিলো এই সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি-শোষণ।

তবে মানুষ এ-অবস্থা সহ্য করতো কেন?

সহ্য ঠিক করতো না। জমিদার ও ভূমিদাসদের মধ্যে যুগে যুগে রক্তাক্ত সংঘর্ষের সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে। এ বইয়ের পাতাতেও সে-কাহিনী কিছুটা ঠাঁই করে নেবে আশা করি।

কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা ভুললে চলবে না। একটি সংসার—একখানি ঘর—একটুকরো জমি—নিজের বলে পাবার মতো এই জিনিসগুলো ভূমিদাসের ছিলো। জীবনের যে নিশ্চিন্ততা আসে এই অধিকারগুলো থেকে, তাই এনেছে ক্রীত-দাসত্ব থেকে ভূমিদাসত্বের ব্যবধান। জমিদার যদি জমি বিক্রিও করে দেয়, তাতে ভূমিদাসের জমি হারাবার ভয় নেই,—তার মালিক পাল্টালো মাত্র।

ভূমিদাসদের বসতি ইউরোপের এই গ্রামগুলোর বিলিতি নাম হলো 'ম্যানর'। ম্যানরের জমির যদি হিসেব নেওয়া যায়

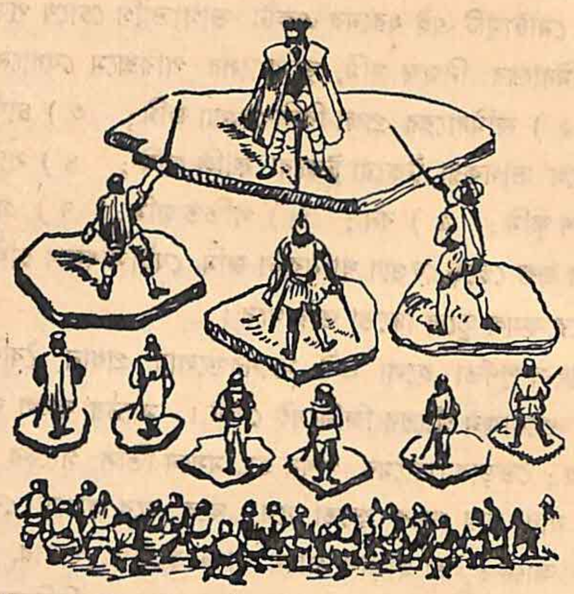
তাহলে মোটামুটি এই ধরনের একটা ভাগাভাগি চোখে পড়বে : ১) জমিদারের নিজস্ব জমি, ভূমিদাসের পরিশ্রমে যেখানে চাষ হয়; ২) জমিদারের প্রজা-বিলি-দেওয়া জমি ; ৩) চাষীদের তিনভাগে ভাগকরা টুকরো টুকরো ফালি জমি ; ৪) সাধারণ গোচারণ ভূমি ; ৫) বন ; ৬) পতিত জমি ; ৭) গ্রামের পাদরির জন্য ছেড়ে দেওয়া খানিকটা জমি, যেটা সাধারণ চাষীরাই চাষ করে ফসল তুলে দিতো তার ঘরে।

স্বয়ং-সম্পূর্ণতা হলো এই ম্যানরগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রামের প্রয়োজন গাঁয়ের জিনিসেই মেটে। মাঠের ফসল খাবার জোগায় ; ভেড়ার লোমের পশম হয়, মসনে-তিসি গাছের আঁশ পাওয়া যায় যার থেকে সুতো হবে ; ঘরে ঘরে কাপড় বোনার ব্যবস্থা আছে ; তা ছাড়াও গ্রামে আছে ছুতোর, কামার, মুচি। জিনিসপত্রের দেওয়া-নেওয়া চলে সে-যুগের বস্তু-বিনিময়-প্রথা অনুযায়ী ;—অর্থাৎ, জিনিসের বদলে জিনিস। গ্রামে উৎপাদন হতো গ্রামের প্রয়োজন বুঝে, সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে।

শুধু অর্থনীতিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণই নয় এই ম্যানরগুলো। ম্যানরের মালিক জমিদার-প্রভু শুধু শোষণই করে না, বিচার ও শাসনের ভারও তারই হাতে। আবার, যুদ্ধ-বিগ্রহে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার। কাজেই সব দিকে খণ্ডীকৃত, গণ্ডীবদ্ধ জীবনই মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য।

॥ ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র : প্রভুসমাজের কথা ॥

মধ্যযুগের ইউরোপ। মালিক ছাড়া ম্যানর নেই। ম্যানর



ছোটোই হোক আর বড়োই হোক, জমিদার তার থাকবেই। কিন্তু একটা ম্যানরের পরিধি দেখে জমিদারের গুরুত্ব বোঝা যাবে না। কারণ, একজন জমিদার একাধিক ম্যানরের অধিপতি হতে পারে। কাজেই জমিদারের গুরুত্ব নির্ভর করবে কতোগুলো ম্যানর আর কতো বড়ো বড়ো ম্যানরের মালিক সে।

তার মানে, জমিদাররাই সব জমির মালিক নাকি ?

তা কিন্তু নয়! ম্যানরের জমিদার এই ম্যানর বন্দোবস্তি নিয়েছে আর একজন বড়ো জমিদারের কাছ থেকে; সে আবার নিয়েছে হয়তো আরো বড়ো জমিদারের কাছ থেকে। ছোটো থেকে বড়ো, তার থেকে আরও বড়ো, এমনি করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছনো হতো রাজার কাছে। আইনের চোখে

রাজাই হলো সব জমির মালিক।

আসলে রাজা ছিলো জমিদারদের মধ্যে প্রধান। কারণ, সৈন্য-সামন্ত জোগাতো এই সব জমিদাররা। রাজার সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকতো না। এদিকে জমিই যেখানে সব সম্পদের উৎস, সেখানে জমি বাড়াবার, বলতে গেলে, একমাত্র উপায় ছিলো যুদ্ধ করে অপরের জমি কেড়ে নেওয়া। কাজেই নিজেদের সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে বড়ো বড়ো জমিদারেরা সব সময়েই নিজেদের তলায় ছোটো ছোটো তালুকদার (ভ্যাসাল) বসাবার চেষ্টা করতো। রাজার কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হবার ফলে সমস্ত মধ্যযুগেই যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রের লীলাভূমি হয়ে ছিলো।

সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের প্রভুসমাজের আর এক অংশ হলো পাদ্রিরা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান 'ক্যাথলিক চার্চ'। আসলে যে কোনো রাজার চেয়ে ক্ষমতাশালী ছিলো এই 'ক্যাথলিক চার্চ'। কারণ, সারা ইউরোপময় এর প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং সংগঠন। তা ছাড়া সারা ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো জমিদারও ছিলো এই চার্চ। কোনো জমিদারের বিবেক দংশন করছে স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে,—চার্চকে কিছু জমি দান করে পাপ লাঘব করলো। কেউ যুদ্ধে নতুন এলাকা জয় করে এসে কিছু অংশ চার্চকে উৎসর্গ করলো। কারুর বা ধর্মভীরু মন,—চার্চের সৎকাজের জন্যেই দান করলো আরও কিছু জমি। এইভাবে জমতে জমতে সারা ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত জমির মালিক হয়ে বসলো 'রোমান ক্যাথলিক চার্চ'। পাদ্রিরা আর পাঁচজন জমিদারের মতোই,—তাদের চেয়ে বেশি বৈ কম নয়,—প্রজা

শোষণ করতো, ওপরতলার বড়ো জমিদার বা রাজার কাছে কুর্নিস বাজাতো, যুদ্ধের সৈন্যসামন্ত-রসদ সরবরাহ করতো। এক কথায়, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান খুঁটিই ছিলো এই 'ক্যাথলিক চার্চ'।

কিন্তু জমিদার হিসেবেও চার্চের আবার বৈশিষ্ট্য ছিলো। জমিদারের সাধারণ শোষণ ছাড়াও চার্চের ছিলো নিজস্ব করভার। প্রত্যেকটি লোককেই তার আয়ের এক-দশমাংশ কর নিবেদন করতে হবে চার্চের কাছে। আর, এই 'দশমাংশের' হিসেবের কড়াকড়িটা একবার দেখবে। ভেড়ার লোমের দশমাংশ হিসেব করবার সময় হাঁসের পালকের দশমাংশও হিসেব করা হতো; ফসলের দশমাংশ ধরতে গিয়ে কাটা ঘাসের কথা ভুল হতো না; কেউ যদি 'এক-দশমাংশ' হিসেবের সময় খরচ-খরচা বাদ দিয়ে থাকে তবে তার অনন্ত নরক অনিবার্য।

এক সময়ে 'ক্যাথলিক চার্চ' ভালো কাজ কিছু হয়তো করে-ছিলো। রোম সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি কিছুটা বেঁচেছিলো এরই ছত্রচ্ছায়ায়। এরই চেষ্টায় শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে, শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। চার্চ গরিবকে সাহায্য দিয়েছে; বাপ-মা-হারা ছেলেপিলেকে অনাথাশ্রমে মানুষ করেছে; রোগীদের জন্যে হাস-পাতাল গড়েছে। চাষবাসের দেখাশোনাও হয়তো আর পাঁচজন জমিদারের চেয়ে চার্চের হাতেই আরও ভালো করে হয়েছে।

কিন্তু এ-কথাও মনে করার কারণ রয়েছে যে, চার্চের এই কল্যাণকর কাজের কথা নিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করা হয়েছে। চার্চের কাছ থেকে দরিদ্র ও রুগ্ন সাহায্য পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু

ইউরোপের সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী জমিদার ছিলো 'ক্যাথলিক চার্চ'। সেই দিক থেকে বিচার করলে বরং সাধারণ জমিদারদের দানের পরিমাণই বেশি। সংকাজের জন্যে চার্চ ভিক্ষা চেয়েছে ও নিয়েছে, কিন্তু নিজের সিন্ধুকের দরজা বিশেষ খোলে নি। আর তা ছাড়া এও তো ভাববার বিষয় যে, সবচেয়ে বড়ো জমিদার হিসেবে চার্চ নিজেই যদি ভূমিদাসদের এতো শোষণ না করতো তা হলে হয়তো গরিবদের সাহায্য করার সমস্যাও এতো জরুরী হতো না।

॥ ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র : বণিক-আবির্ভাবের কথা ॥

কথায় বলে : টাকাতেই টাকা আনে। দু পয়সা কামাতে চাও, তো টাকা ঢালো, ব্যবসায় খাটাও, তবে তো রোজগার হবে।

আজকের দিনে তোমার হাতে যদি টাকা জমে, তা হলে তুমি ভাববে, কী করে সেই টাকাটা কাজে লাগানো যায় : ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগানো, কি 'শেয়ার' কেনা, নিদেনপক্ষে ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া—যাতে সুদটা ঘরে আসে।—এইরকম কোনো না কোনো উপায়ে টাকাটা তুমি কাজে লাগিয়ে দেবে।

কিন্তু মধ্য যুগের ইউরোপ হলে টাকাকে কাজে লাগানো যেতো না।

কেন, তা তো আগেই বলা হয়েছে।—টাকার ব্যবহারটা কোথায় বলো? টাকা দিয়ে কিনবে কী? স্বয়ংসম্পূর্ণ ম্যানর জীবনের কথা ভেবে দেখো। বড়োলোকের যা দরকার ভূমিদাসরা জোগাচ্ছে; গরিবদের যা দরকার নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছে। সপ্তাহে

এক দিন হয়তো হাট বসে, কিন্তু সেখানেও বস্তু-বিনিময় প্রথায় জিনিসের বদলে জিনিস নিয়ে যে যার বাড়ি যায়।—ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে বিশেষ কিছু তখন নেই।

তার পথে বাধাও কি কম ছিলো। জিনিসপত্রের চাহিদাই নেই, লোকে বানাবেই বা কী আর হাটে আনবেই বা কী। তার ওপর যাতায়াতের পথ-ঘাট বেজায় খারাপ। পথে দু রকমের লুটের ভয় : এক, খাটি নির্ভেজাল ডাকাত এসে লুটেপুটে নিয়ে যাবে; দুই, ম্যানরের অধিপতিরা তাদের সীমানার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার দরুন মাশুল আদায় করবে। এদিকে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রার অভাব, যা আছে তাও সব জায়গায় চলে না। তার ওপর, ওজন মাপ প্রভৃতিরও নানা তারতম্য। ফলে, ব্যবসা জাকিয়ে আসর পাততে পারে না।

কিন্তু এমন দিন আর রইলো না বেশি। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের চেহারা পাল্টিয়ে গেলো। বাণিজ্যের সোনার সুতোয় সারা ইউরোপ বাঁধা পড়লো। জমিদার-প্রভু ও ভূমিদাস-চাষী এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি গড়ে উঠলো আর এক নতুন রকমের মানুষ—ব্যবসায়ী মধ্যশ্রেণী। আর দিকে দিকে গড়ে উঠলো বাণিজ্যের কেন্দ্র, ব্যবসায়ী মধ্যশ্রেণীর আবাসস্থল,—শহর আর বন্দর।

মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্যে খ্রীষ্টানদের যে ধর্মযুদ্ধ,—ইতিহাসে যা 'ক্রুসেডস' নামে খ্যাত,—তাই কিন্তু এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে দায়ী।

ইউরোপে মুসলমান অভিযানের কথা দ্বিতীয় খণ্ডেই বলা

হয়েছে। মুসলমানদের হাত থেকে সারা খ্রীষ্টানভূমিকে বাঁচাবার জন্যে বাইজান্টিয়াম থেকে আকুল আবেদন আসতে লাগলো। রোমের পোপ দেখলেন যে, মুসলিম-বিরোধী যুদ্ধে যদি সমস্ত খ্রীষ্টান শক্তিকে এক করা যায় তো পোপের প্রতিষ্ঠা বাড়বে, যুদ্ধ-জয়ের মারফতে নতুন এলাকায় খ্রীষ্টধর্মের প্রসার হবে, আর মারমুখো সামন্তবাদী সর্দারদের নিজেদের মধ্যে কাটাকাটিটা বন্ধ হবে। অবিশ্বাসীদের হাত থেকে জেরুজালেমের পবিত্র সমাধি উদ্ধারের জন্যে, ১০৯৫ সালে, পোপ দ্বিতীয় আরবন্, সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের জেহাদ ঘোষণা করলেন।

এ ধর্মযুদ্ধে আন্তরিকতার অভাব ছিলো—এমন কথা কেউ বলছে না। বরং, সারা ইউরোপের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ধর্মোন্মাদনা দেখা যায়, তার জুড়ি খুব কমই মেলে। সন্ত-পিটার নামে এক ভদ্রলোক তো সারা ফ্রান্স ও জার্মানি চষে ফেললেন। পরনে মোটা কাপড়, খালি পা, হাতে এক বিরাট 'ক্রস্', গাধার পিঠে চড়ে চলেছেন সন্ত-পিটার। হাটে, পথে, গীর্জায়—যেখানেই মানুষ জমায়েত হয়ে আছে,—সন্ত-পিটার সেখানেই 'ক্রুসেডে'র বাণী বয়ে নিয়ে গেছেন। লোকে সাড়া দিয়েছিলো বৈ কি।

কিন্তু এ ধর্মযুদ্ধের আসল পরিচালিকা শক্তি ছিলো স্বার্থবোধ। বাইজান্টিয়াম ও পোপের স্বার্থের কথা আগেই বলেছি। সমস্ত সর্দারেরা, বিশেষ করে যাদের ট্যাকে টান ধরেছে তারা, এই ধর্মযুদ্ধকে দেখেছে অর্থ ও ভূসম্পত্তি জয় করার উপায় হিসেবে। আর ছিলো ভিনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি ইটালির প্রাচীন শহর-বন্দরগুলো। এরা চেয়েছিলো মুসলমান ও বাইজান্টাইন

ব্যবসায়ীদের হটিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যটা নিজেরাই দখল করতে।

কাজেই 'ক্রুসেডস'-এ ধর্মযুদ্ধ-ন্যায়যুদ্ধের চেয়ে অন্যায় লুঠ-তরাজের দৃশ্যই বেশি চোখে পড়ে। বহুবার লড়াই হয়েছে, বহু রক্তক্ষয় হয়েছে। জেরুজালেম শেষ পর্যন্ত দখল হয় নি, কিন্তু ইউরোপ বদলেছে।

সারা ইউরোপ ম্যানর-জীবনের ক্ষুদ্র সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য জীবনধারা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। সৈন্যদের পিছু পিছু তাদের রসদ জোগাবার জন্যে ব্যবসায়ীরা গেছে, পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করেছে, সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সামন্ত সর্দাররা প্রাচ্য বিলাসিতার স্বাদ পেয়ে এসেছে, নতুন জিনিসের চাহিদা তৈরি হয়েছে। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্যসূত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সারা ইউরোপের সরবরাহ-কেন্দ্র হিসাবে দেখা দিলো দুটি শহর; দক্ষিণে দাঁড়ালো ভিনিস,—প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে; আর রুশিয়া ও উত্তর ইউরোপের যোগাযোগ-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলো ফ্ল্যাণ্ডার্সের ব্রুগেস শহর।

সপ্তাহান্তের ছোটো হাটে আর কুলোয় না; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালিতে বসতে লাগলো বিরাট বিরাট মেলা। বড়ো বড়ো জমিদাররা অনেকে তাদের নিজেদের এলাকায় এই সব মেলা বসাবার কাজে উদ্যোগী হলো। নিরাপদে যাতায়াত করার ব্যবস্থা, নানা ধরনের মাশুল আদায় বন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও বণিকদের দেওয়া হতে লাগলো।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ম্যানর-জীবন ও বস্তু-বিনিময় প্রথার অর্থনীতি বদলে ইউরোপ মুদ্রাবিনিময়ের অর্থনীতি গ্রহণ করলো।

বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে শহর-বন্দর গজিয়ে উঠলো।

শহর কি আর আগে ছিলো না একেবারেই? তা ছিলো। রাজদরবারকে ঘিরে শহর-মতন জিনিস ছিলো বৈ কি। কিন্তু এই নতুন শহরগুলোর চরিত্র আলাদা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে দূর-দূরান্ত থেকে রাজপথ যেখানে এসে মিশেছে, যেখানে নদীর মোহনা, অথবা যে-জমিটার অবস্থিতি সুবিধাজনক—সেই সব জায়গায় শহর গজিয়ে উঠতে লাগলো।

প্রথমে হয়তো এই সব শহর কোনো সামন্ত-প্রভুর দুর্গ বা মঠের ছত্রচ্ছায়ায়ই তৈরি হলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো সামন্তবাদের সঙ্গে এই শহর-জীবনের খাপ খায় না। সামন্ত-প্রভুরা এই ব্যবসায়ী শহরবাসীদের পুরোনো দিনের প্রজা হিসেবেই চালাতে চায়; কিন্তু তাতে পোষাবে কেন নতুন এই মধ্যশ্রেণীর?

ব্যাপারটা বোঝো! এরা হচ্ছে বণিক-ব্যবসায়ী। যেমন ইচ্ছে এদের শহরে যাতায়াত করা দরকার। শহরের জমি এদের আর-পাঁচটা জিনিসের মতোই সম্পত্তিবিশেষ,—কাজেই দরকারমতো তা কেনাবেচা করতে পারা চাই। এদের ব্যবসায়ী জীবনের নিয়ম-কানুন আলাদা,—সুতরাং সামন্তবাদী কায়দায় এদের মামলা-নিষ্পত্তি করা বা সামন্তবাদের সাত শো রকমের কর দেওয়াও

এদের পোষায় না।

এক কথায়, শহরবাসীরা চাইলো সামন্তবাদীদের গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি।

সে-মুক্তি তারা আদায়ও করেছিলো! তবে,—একদিনে নয়!

ঐক্যই শক্তির উৎস—এটা বণিকদের শিখতে হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা থেকে। শহরে বণিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন 'গিল্‌ড' গড়ে উঠেছে।

সামন্তপ্রভুর টাকার দরকার,—গিল্‌ডের প্রধানদের ডেকে পাঠিয়েছে টাকার জন্যে। এ তরফ থেকে জানানো হলো যে টাকা এরা দিতে রাজি, কিন্তু তার বদলে শহরবাসীর কতোগুলো অধিকার হুজুরকে মানতে হবে। হুজুর রাজি হলো না, দরাদরি চললো। অবশেষে কিছু দিলো। পরে হয়তো ভুলে গেলো আগেকার কথা। কথার খেলাপ হলে দ্বিতীয়বার টাকা আদায় করা মুশকিল। আবার সমস্ত কথা অস্বীকার করে কখনো কখনো হুজুর চড়াও হয়েছে শহরের ওপর; শহরবাসীও তখন অস্ত্র ধরেছে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে।

অধিকারের সনদ বিভিন্ন শহর যা আদায় করেছিলো, তার মধ্যে নানা তারতম্য ছিলো। আর তা ছাড়া সব মানুষের সমান অধিকার-এই ধরনের কোনো বিপ্লবী রণহুঙ্কার নিয়েও এরা এগোয় নি। কারণ, একদিকে ব্যবসার সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্যে এরা যেমন চেষ্টা চালাতো, তেমনি সেই একই উদ্দেশ্যে গিল্‌ড্‌গুলোকে বানিয়েছিলো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান। গিল্‌ডের বাইরের কেউ যাতে বাণিজ্য করার সুযোগ না পায়, তার জন্যেও তারা সমস্ত শক্তি

নিয়ে লড়তো। দেশী-বিদেশী সমস্ত রকম প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করে দিয়ে বাজারটাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রাখতো।

এখন, এতোখানি সুবিধে পেতে গেলে শহরের কর্তৃপক্ষকে হাতে না রাখতে পারলে চলবে কেন? কাজেই, শহরের আমলা-কোটালের দল ছিলো এই সব ব্যবসায়ী-গিল্‌ডের হাতের লোক। কোথাও বা শহরের কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, আর কোনো কোনো শহরে আইনেই বলা ছিলো যে নগর-সরকারে গিল্‌ডের লোক ছাড়া আর কারুর ঠাঁই হবে না।

এই গিল্‌ড্‌গুলো পরস্পর যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে যে কতো শক্তিশালী হতে পারে তার চরম প্রমাণ হচ্ছে জার্মানির 'হ্যান্‌-সিয়াটিক লীগ'। সারা উত্তর ইউরোপের সঙ্গে বাকি দুনিয়ার বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া ছিলো এদের। এদের বাণিজ্যকেন্দ্র-গুলো ছিলো দুর্গবিশেষ। এরা নিজেদের যুদ্ধজাহাজ দিয়ে বাণিজ্য জাহাজ রক্ষা করতো; যাত্রাপথ থেকে জলদস্যুদের উৎখাত করবার জন্যে নিজেদের আইনসভায় আইন বানাতো; বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করতো। একটা পুরোপুরি রাষ্ট্র বলতে আর বাকি ছিলো কী?

সামন্ত যুগের প্রথম দিকে জমিই ছিলো সব সম্পদের উৎস। তখন জমির মালিকানার ওপর নির্ভর করতো সামাজিক মর্যাদা, রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকার। এবার থেকে আর এক রকম সম্পদ সমাজে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। তা হচ্ছে, আর্থিক সম্পদ, —মুদ্রার ঐশ্বর্য। নতুন পথ বেয়ে এ-ঐশ্বর্যের আবির্ভাব, কেনা-

বেচার মাধ্যমে এ-দৌলত জয় করে এনেছে নতুন মধ্যশ্রেণী, ব্যবসায়ীরা। সমাজে এদের আসন আর অস্বীকার করা গেলো না, না গেলো রাষ্ট্র-ক্ষমতায় এদের অধিকারকে ঠেকিয়ে রাখা।

এই সূত্রে আর একরকমের গিল্‌ডের কথাও কিন্তু বলে রাখা দরকার। এগুলো হচ্ছে কারিগরদের গিল্‌ড্। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে নানা ধরনের কারিগরের কাজের চাহিদা বাড়ে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সব কারিগররা শহরে বেশ কায়েমী হয়ে জমে বসতে থাকে। বণিকদের মতো এরাও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গিল্‌ড্ গড়তে থাকে। আলাদা আলাদা শিল্পে আলাদা আলাদা গিল্‌ড্। তাঁতি, ছুতোর, মুচি, কামার, মিস্ত্রী, প্রভৃতি কারিগরদের গিল্‌ডে ওস্তাদ-কারিগর ছাড়াও আরও দু-ধরনের মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিলো। এরা হলো: অ্যাপ্রেন্টিস্ বা শিক্ষানবিশ এবং (২) জার্নিম্যান বা দিনমজুর। বন্দোবস্ত ছিলো, অল্প বয়সে সকলকেই কোনো না কোনো ওস্তাদের কাছে শিক্ষানবিশি করতে হবে। ওস্তাদের ঘরেই খাওয়া-পরা মিলবে, তবে মাইনের বালাই নেই। এই ভাবে তিন থেকে বারো বছর পর্যন্ত শিক্ষানবিশি করলে পর, দিনমজুর হতে পারা যাবে। তারও বেশ কিছুদিন পরে নিজে ওস্তাদ কারিগর হিসেবে গিল্‌ডের মধ্যে সদস্য হিসেবে ঢুকতে পারবে। কর্মদক্ষতার উচ্চপর্যায় বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শুরু হলেও পরে এ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ওস্তাদের দল তলার মানুষের ওপর প্রচণ্ড শোষণ চালাতে থাকে। তীব্র সংঘাতও দেখা দেয় তার ফলে। সে গল্প পরে আর একবার পাড়তে হবে।

॥ দিনবদলের পালা ॥

ইউরোপে দিনবদলের পালা এসে গেলো।

আগে যেমন ছিলো, গাঁয়ের জিনিস গাঁয়েই তৈরি করি, গাঁয়েই খেয়ে-পরে সাফ করে দিই,—তেমন তো আর নেই। বাণিজ্যের সোনার সুতোয় গ্রাম-শহর, দেশ-দেশান্তর বাঁধা পড়ে গেলো। কাজেই এখন পুরোনো ধ্যান-ধারণা, রোজগারের পথ আর রাজনীতির কাঠামো সবই বদলাবে বৈ কি!

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

সুদের কথাটাই ধরো না কেন! টাকা খাটালে,—ধার দিলে বা জমা রাখলে,—সুদ পাওয়া যায়, এ কথাটা আজ সবারই জানা। কিন্তু সে যুগের ইউরোপে......

পাপ! মহাপাপ! পাদরীর দল, সমস্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠবে,—ধার দিয়ে সুদ নিচ্ছো, এ পাপে যে নরকেও স্থান হবে না।

অবশ্য এ কথা বলবার কারণও ছিলো।

ধরো, সে যুগে ধারটা চাইছে কে? কারুর গোরু মরেছে গোরু কিনতে হবে, পোকায় বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়েছে, খোরাকি চালাতে হবে, কিংবা আগুনে ঘর পুড়েছে, ঘর বাঁধতে হবে—এই সব কারণেই না লোকে ধার চাইতো। কাজে কাজেই, অপরের দুর্ভাগ্যের ওপর বেসাতি করা যে ধর্ম ও নীতিবোধে আঘাত করবে, তাই তো স্বাভাবিক।

তাই ধর্মের নির্দেশ অনুসরণ করে বহু জায়গায় সুদ নেওয়া বেআইনি বলে ঘোষিত হয়েছিলো।

কিন্তু, ভেবে দেখো, এরকম কাণ্ড কি নতুন দিনে পোষায়! ব্যবসায় টাকা ঢাললে টাকা আসে: কাজেই ব্যবসাতে টাকা রোজগার করার জন্যে ব্যবসাদারলোক টাকা ধার করবে এবং ধার শোধ দেবার সময় বেশি টাকা দিতেও রাজি থাকবে। টাকা আজ আর সিন্দুকে পচাবার জিনিস নয়: বন্ধ সিন্দুকের মুখ খুলে টাকাকে কাজে লাগাতে হবে।

এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়। চার্চ আর রাজা-রাজড়ারা এর আগেও সুদের কারবারে জড়িত থাকতেন, অবশ্য গোপনে,—এখন সোজাসুজিই বলা হলো: তা কী করা যাবে—টাকা যখন ব্যবসাতে খাটানো হচ্ছে, তখন তো লোকসান যাবারও সম্ভাবনা রইলো; কাজেই এই 'ঝুঁকি' নেবার জন্যে মহাজনকে কিছু দিতে হবে বৈ কি।

বাণিজ্যের প্রয়োজনের দিকটা আর-একবার খতিয়ে দেখো। নিশ্চিন্তে, নিরাপদে, ভালোমতো ব্যবসা চালাতে গেলে সারা দেশময় একই রকম মুদ্রাব্যবস্থা থাকা দরকার, পদে পদে একশো গণ্ডা সামন্ত-সরদারদের শুল্ক আর করের বোঝা থেকে অব্যাহতি পাওয়া দরকার, শক্ত হাতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রয়োজন, আরও প্রয়োজন সারা দেশময় একই ধরনের আইনের ধারা আর বিচারপদ্ধতি।

এই সমস্ত প্রয়োজনবোধই এগিয়ে গেছে একটা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তোলার দিকে, যে রাষ্ট্রশক্তির ধারক হয়ে দেখা দিলো নতুন ধরনের রাজা ও রাজবংশ।

আরও মনে রাখতে হবে: এই সময়টায় সামন্ত সরদারের

বিরুদ্ধে শুধু বণিকসমাজই যে লড়াই চালাচ্ছে তা নয়, প্রচণ্ড সংগ্রামে ফেটে পড়ছে ভূমিদাসরাও। শহরেও শুরু হলো সংগ্রাম। আর এই সব কারণেই মালিকদের পক্ষে একটা শক্তি-শালী কেন্দ্রীয় শাসন দরকার হয়ে পড়লো।

আরও একটা কথা ভুললে চলবে না: বাণিজ্যসূত্র শুধু যে একসাথে গাঁথে তাই নয়, বিভেদও আনে। অর্থাৎ, এই বণিকরা শুধু যে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, নতুন ধরনের রীতিনীতি, বিচারপদ্ধতি চালু করবার চেষ্টা করছে, তাই নয়— এই সমস্ত কিছু করছে তাদের নিজেদের স্বার্থে, একটা সমগ্র বাজারকে নিজেদের এক্তিয়ারে রাখার জন্যে। তাই তাদের চেষ্টা, সে-বাজারে যেন অন্য কোনো বণিকের দল দাঁত ফোটাতে না পারে। কাজে কাজেই, ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে, বিভেদের প্রাচীরও উঠলো। গণ্ডীটা তবে দাঁড়ালো কোথায়?

তাহলে অবস্থাটা কী রকম হয়ে দাঁড়ালো? গ্রামের চাষীরা বিদ্রোহ করছে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে। শহরের বণিকরা সামন্তদের বিরুদ্ধে অনেক জায়গাতেই চাষীদের প্রতি দরদ দেখাচ্ছে।—কাজেই এই সব মিলিয়ে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ গড়ে তুলছে মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম।

এই দেশপ্রেমেরই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক এখানে।

ইংল্যাণ্ডের রাজা ও রাজবংশ ছিলো ফ্রান্সের এক বিরাট জমিদারির মালিক। সাধারণভাবে তাহলে এদের ফরাসী রাজারই অনুগত থাকা উচিত; কিন্তু কার্যত দেখা গেলো এরা সমস্ত ফ্রান্সেরই প্রভু হয়ে বসতে চায় এবং সেই সূত্রে একটা উত্তরা-

ধিকারগত দাবিও খাড়া করলো। একশো বছর ধরে এই দাবি-দাওয়ার লড়াই চললো ;—অর্থাৎ, কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধ স্থগিত থাকে, আবার হয়। ক্রমে ইংরেজদের কয়েকটা বড়ো বড়ো জয়ের ফলে অবস্থাটা এমনই দাঁড়ালো যে, রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রান্স বুঝি আর টেঁকে না, সামন্ত সরদারের ক্ষমতা খর্ব করে করে যে ঐক্যবদ্ধ ফরাসী রাষ্ট্র গড়ে উঠছিলো তা বুঝি-বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমন সময়ে যুদ্ধ ও রাজনীতির পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালো জোয়ান অফ আর্ক। চাষীর ঘরের মেয়ে, জোয়ান বললো : সে ঈশ্বরের আদেশ শুনেছে, তাকে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেত্রী হিসেবে ইংরেজ-বেষ্টিত অরলীন্স দুর্গকে মুক্ত করতে হবে, রাজার অভি-ষেকের ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সামান্য মেয়ের দাবি রাজদরবারে উপহসিত ও প্রত্যাখ্যাত হলো না। জোয়ান সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা হিসেবে অরলীন্স-এর দিকে অগ্রসর হলো ; অরলীন্স মুক্ত হলো। দেখতে দেখতে সমগ্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফরাসীরা আক্রমণ করতে লাগলো ও ইংরেজরা একটার পর একটা পরাজয় বরণ করতে লাগলো।

জোয়ানের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের একমাত্র ব্যাখ্যা হয় এই যে সমস্ত ফরাসী মানুষের মনের গভীরে যে ক্ষুব্ধ দেশপ্রেম মাথা তোলবার চেষ্টা করছিলো তার সমস্ত অন্তরায় দূর করে দিলো জোয়ান। জোয়ানের উপস্থিতি, তার বাণী, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এনে দিয়েছিলো অদ্ভুত আস্থা ও সাহস। সৈন্যশিবির থেকে চাষীর কুটীর পর্যন্ত এক অদ্ভুত বিশ্বাসের বান ডেকেছিলো। কিন্তু ফরাসী সামন্ত সরদাররা ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখে নি।

নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ফলে অল্প কিছুদিন পরে জোয়ান ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়। ইংরেজরা তাকে 'ডাইনি' বলে ক্রসে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারে! কিন্তু জোয়ান মারা গেলেও তার আরব্ধ কাজ সফলতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। ১৪৫৩ সাল নাগাদ ইংরেজরা একমাত্র ক্যালে বন্দর ছাড়া বাকি সমস্ত ফরাসী মাটি থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয়।—ষোড়শ শতাব্দীর শেষে সমগ্র ফ্রান্স একটি কেন্দ্রীভূত জাতিভিত্তিক রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

জোয়ান অফ আর্কের গল্প থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধের চেতনা সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে তুলেছিলো। সারা-ইউরোপ-জোড়া এক খ্রীষ্টানিস্তানের ধারণা বিদায় নিয়েছে। লেখবার ভাষা একমাত্র লাটিন ভাষা,—এ চিন্তা দূর হয়েছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, যা এতোদিন অশিক্ষিত-দের কথ্য ভাষা হিসেবে অনাদৃত ছিলো, তাই আজকে নতুন সাহিত্যের জন্ম দিচ্ছে। রাজনীতির তত্ত্বালোচনার দিক থেকে ইটালির মেকিয়াভেলি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের জন্যে আবেদন জানিয়ে বই লিখছেন। তাঁর বই সে যুগের রাজনীতিজ্ঞদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো। গ্রোটিয়াস আন্তর্জাতিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের প্রভাব এড়িয়ে আধুনিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও সামন্ত সরদারের বিরোধিতাকে ভেঙে আধুনিক কালের জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এই রকম মোটামুটি একই ধরনের শক্তিসমন্বয়ের ভিত্তিতে—কিন্তু স্থানভেদে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে,—নানা ঘটনার ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি গড়ে উঠলো ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, স্পেনে, পোর্তুগালে। সুইজার্ল্যাণ্ডে কনফেডারেশন নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠলো। উত্তর ইউরোপে তিনটি রাজ্য মাথা তুললো : নরওয়ে, ডেনমার্ক ও সুইডেন। এ তিনটির মধ্যে ডেনমার্কের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুইডেন ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে গেলেও, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীন থাকে। মধ্য ইউরোপে চেক, ম্যাগিয়ার, ক্রোয়াট, শ্লোভাক, রুমানিয়ান, প্রভৃতিরা নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। মধ্যযুগের শেষে একমাত্র পোল্যাণ্ড ছাড়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আর কারুরই সাক্ষাৎ মেলে না এ অঞ্চলে। ওদিকে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়া থেকে আগত মঙ্গোলদের পরাজিত করে ঐক্যবদ্ধ ও জাতিভিত্তিক রুশ রাজত্বের পত্তন করেছেন মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক, "মহান্ ইভান"।

কিন্তু এতো কিছু ওলট-পালট ভাঙা-গড়ার ভেতরেও জার্মানি ও ইটালি ঐক্যবদ্ধ রাজশক্তিতে পরিণত হলো না। এই ব্যর্থতার প্রধানতম কারণ ছিলো জার্মান রাজাদের সার্লেমানের সাম্রাজ্যের অনুরূপ আর এক ইউরোপজোড়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার অন্ধ প্রচেষ্টা। সে চেষ্টা ইউরোপের শান্তি নষ্ট করেছে, জার্মানি ও ইটালিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে দেয়নি,—এক কথায় ইতিহাসের অগ্রগতির রাশ পেছনে টেনে ধরেছে।

।। নব জীবনের গান ।।

নতুন যুগের নতুন আশা, নতুন ভাষা, নতুন তার চিন্তাধারা।

ইউরোপের সংস্কৃতিতে রূপান্তর শুরু হয়ে গেছে। এই রূপান্তরের ইউরোপীয় নাম হলো রেনেসাঁস; কথাটার বাঙলা করলে দাঁড়ায় "পুনরুজ্জীবন"।

সংস্কৃতির এই পুনরুজ্জীবন শুরু হলো চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইটালির শহরগুলো থেকে। বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে শহরগুলো ঐশ্বর্য-সম্পদে ফেঁপে উঠেছে। শহরগুলোর প্রধান যারা, সেই বণিক-মহাজনদের হাতে বই, ছবি বা নানান সৌন্দর্য-সামগ্রী কেনবার মতো অর্থ রয়েছে। ব্যবসার মারফত বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং সে সম্পর্কের মারফত পরিচয় মিলেছে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সাংস্কৃতিক উপচারের। ব্যবসা এবং রাজকার্যে পোপ বা সম্রাটের হস্তক্ষেপ যেমন এরা সহ্য করতে পারে না, তেমনি তৃপ্তি পায় না ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মনীতি নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতে। কাজেই এখানে শুরু হলো নতুন চিন্তাধারা,—'হিউম্যানিজম' বা 'মানবতাবাদ' এই নাম নিয়ে।

মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রথম এলো প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে প্রথম প্রথম প্রচণ্ড মাতামাতি চললো। যার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ইটালিতে রেনেসাঁসের প্রথম প্রবক্তা পেত্রার্কের কাহিনী। ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ তাঁকে স্মরণ করে রেখেছে তাঁর প্রাদেশিক ইটালীয় ভাষায় লেখা অমর সনেটগুলির জন্যে; কিন্তু তিনি নিজে ভেবেছিলেন যে তাঁর অমরত্বলাভ ঘটবে

লাটিন ভাষায় লেখা মহাকাব্যের কল্যাণে,—এমনি ছিলো তখন প্রাচীনত্বের নেশা। যাই হোক, ক্রমেই মানবতাবাদ মধ্যযুগীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো। মধ্যযুগ শিখিয়েছিলো : পরলোকই হলো সবকিছু ; এ জীবনটা পরলোকের জন্যে আত্মার প্রস্তুতি ও সাধনামাত্র। নতুন মানবধর্ম বললো : পরলোক নিয়ে হৈ-চৈ করবার দরকার কী ? এ জীবনেই যথেষ্ট আনন্দ-সম্ভার রয়েছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না, উপভোগ করতে হয়। মধ্যযুগ গড়ে উঠেছিলো অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক স্তরভেদের ওপর ; জন্ম থেকেই যার যা স্থান তা নির্ধারিত হয়ে আছে, তা মানতে হবে এবং ওপরওলাকে সেলাম বাজাতে হবে। নতুন যুগের মানবতাবাদ শেখালো : সামন্ত সরদাররা নিষ্কর্মা ও মূর্খ এবং পাদরীরা অসৎ ও ধূর্ত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা ঘোষণা করা হলো ; গ্রাম-সমাজ, শহরের গিল্‌ড্ এবং পাদরী ও চার্চের কড়া শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হলো রেনেসাঁসের চিন্তাধারায়। মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও সম্মানকে প্রথম আসন দেওয়া হলো। রেনেসাঁসের সৃজনীশক্তি ইটালি থেকে শুরু করে সারা ইউরোপকে কূলহারা বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেলো তার সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিতে, তার বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, তার ভৌগোলিক আবিষ্কারে, তার ধর্ম ও দার্শনিক মতপ্রতিষ্ঠায়।

রেনেসাঁসের প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ হয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির (১৪৫২-১৫১৯) মধ্যে। একই লোকের মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের এমন সমন্বয় বিরল। অ্যারিষ্টটলের লেখা

পুথিপত্রে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। গণিত, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরস্থান (অ্যানাটমি), শারীরতত্ত্ব (ফিজিওলজি) বা স্থাপত্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিলো না: তেমনি অসীম ছিলো তাঁর আগ্রহ কাব্যে আর সংগীতে; আর অপরূপ ছিলো তাঁর সৃষ্টিশক্তি চিত্রশিল্পে আর ভাস্কর্যে। তবু ছবির ক্ষেত্রেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাঁর আঁকা 'মোনা লিসা' বা 'দি লাস্ট্ সাপার' মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির অন্যতম।

নবজাগ্রত ইটালির অপর মহৎ শিল্পী রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০)। তাঁর পরেই উল্লেখ করতে হয় আর-এক বিস্ময়কর প্রতিভার। ইনি হলেন মাইকেল এঞ্জেলো বুওনারোটি (১৪৭৫-১৫৬৪)। শিল্পী, ভাস্কর, এঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি হিসেবে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন মাইকেল এঞ্জেলো। রোমের সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদের ভেতরের দিকে তাঁর আঁকা ছবি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দশ হাজার বর্গফুট ছাদকে ১৪৫টা ছবি দিয়ে তিনি ভরিয়েছেন। পুরো চার বছর ধরে উঁচু ভারার ওপর চিত হয়ে শুয়ে তাঁকে আঁকতে হয়েছিলো। বাইবেলের গল্প এ ছবিগুলোতে রূপ পেয়েছে ঠিকই; কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলোর হাতে ঈশ্বর শুধু মানুষের মূর্তি গ্রহণ করেছেন তাই নয়, মানুষও হয়ে উঠেছে দেবতার মতোই সুন্দর ও শক্তিধর। অথচ, এ দায়িত্ব নেবার আগে মাইকেল এঞ্জেলো অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে তিনি আসলে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী নন।


মাইকেল এঞ্জেলো

এ ছাড়াও রেনেসাঁসের শিল্পী হিসেবে বেল্লিনি জর্জিয়োন, টিশিয়ান, ভেরোনিজ, টিণ্টোরেট্টো প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীর নামোল্লেখমাত্র করছি এখানে।

রেনেসাঁসের ইটালির প্রধান পরিচয় যেমন চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে, ফ্রান্সের পরিচয় তেমনি প্রধানত সাহিত্য-সৃষ্টিতে। ইউরোপ ততোদিনে বই-ছাপতে শিখে গেছে। এই ছাপার কাজ সাহিত্য-সাধনার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। ফরাসী ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি করলেন রাবেলাইস (১৪৯৫—১৫৫৩)। সে সাহিত্যে তৎকালীন জীবন যে নিখুঁত রূপ পেলো তাই নয়, তাঁর লেখনী তীক্ষ্ণ কশাঘাতে ঝলসে উঠলো সবরকম ভণ্ডামি আর শঠতা-নীচতার ওপর। নিজে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন,—যদিও সন্ন্যাসধর্ম খুব যে একটা পালন করতেন তা মনে হয় না; তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও সবচেয়ে বেশি বর্ষেছে এই সন্ন্যাসীদেরই ওপরে। এদিকে যে মানবধর্ম রূপ পেলো রাবেলাইসের গল্প-কাহিনীতে, তাই কিন্তু গম্ভীর, মধুর অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ঋজুতায় প্রকাশিত হলো মন্‌টেইন (১৫৩৩-১৫৯২) ও বোডিনের প্রবন্ধাবলীতে। অবশ্য এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন ঈরাস্‌মাস্‌ (১৪৬৬—১৫৩৬)। হল্যাণ্ডের রটারডামে তাঁর জন্ম, কিন্তু ইউরোপের সব দেশেই তাঁর দিন কেটেছে। ইউরোপের সব দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই তাঁর মননশীলতার প্রভাব অনুভূত হতো; চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া চলতো পোপ, সম্রাট থেকে শুরু করে সমস্ত বড়ো লেখকদের সঙ্গেই। কিন্তু চিন্তার দিক থেকে তিনি ছিলেন সাবধানী,

সহনশীল, নরমপন্থী, যুক্তিবাদী। তিনি সমালোচক ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী ছিলেন না। স্পেন দেশের সার্ভানটিসের (১৫৪৭-১৬১৬) নাম বোধ হয় আমাদের দেশের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের কাছেও পরিচিত তাঁর লেখা 'ডন কুইক্সোটের' কাহিনীর কল্যাণে। এক স্বপ্নবিলাসী নাইটের নানারকমে নাকাল হাওয়ার যে গল্প লিখেছেন সার্ভানটিস তাঁর উপন্যাসে, তা শুনে ছেলেবুড়ো সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটা শুধু হাসির গল্পই নয়; তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের বাণে বাণে মধ্যযুগীয় নাইটপ্রথার ভণ্ডামি ও মূর্খতার মুখোসটা তিনি ছত্রখান করে দিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের রেনেসাঁসের পরিচয়ও সাহিত্যে। স্যার টমাস মোর লিখলেন 'ইউটোপিয়া' লাটিন ভাষাতে। এ বইয়ে তিনি কল্পনা করলেন এক শোষণহীন, অত্যাচারহীন স্বপ্নরাজ্য। আজও পর্যন্ত কল্পনায় সুখস্বপ্ন গড়ার ইংরাজী নাম হচ্ছে 'ইউটোপিয়ানিজম' :—এই কথাটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে বইটার প্রভাব সম্পর্কে। খোদ ইংরাজী ভাষায় টমাস ওয়াট্ ও আর্ল অফ সারে চতুর্দশপদী কবিতা আমদানি করলেন। স্পেন্সার লিখলেন 'ফেয়ারি কুইন'।

কিন্তু ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটলো তার নাট্যকারদের শিল্পসৃষ্টিতে। 'হ্যামলেট' 'ম্যাকবেথ' 'ওথেলো' 'কিং লীয়ার' 'টেম্পেষ্ট' 'মার্চেণ্ট অফ ভীনিস' 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' প্রভৃতির স্রষ্টা উইলিয়াম শেক্স্পীয়রের জীবনকাল ১৫৬৪ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত। রেনেসাঁসের ইংল্যাণ্ডের মূল সুর যেমন ধ্বনিত হয়েছে শেক্সপীয়রের নাটক ও কবিতায়, তেমনি শেক্স্পীয়র তাঁর

নিজের যুগের চিন্তাধারার সীমারেখা ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও রূপ দিয়েছেন। সে দিক থেকে শেক্‌স্‌পীয়র কালজয়ী। বরঞ্চ তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন অন্য দুজন প্রতিভাবান নাট্যকার, ক্রিষ্টোফোর মার্লো এবং বেন জনসন তাঁদের যুগকেই বেশি করে প্রতিভাত করেছেন তাঁদের সাহিত্যে। এই সূত্রে বিখ্যাত প্রবন্ধকার সার ফ্রান্সিস বেকনের নামও স্মরণীয়। কয়েকজন চিত্রশিল্পীর নাম স্মরণ করেই আমার এখানকার বক্তব্য শেষ করবো। এঁরা হলেন হল্যাণ্ডের ভ্যান আইক ভ্রাতৃযুগল, পিটার ব্রুঘেল এবং জার্মানির ডুরার এবং হান্‌স্ হলবেইন। ইটালির শিল্পরীতিতে প্রভাবান্বিত হলেও এঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নতুন নতুন অঙ্কনশৈলীর প্রবর্তন করলেন। ভাবের দিক থেকে এঁরাও কিন্তু মূলত মানবধর্মেরই জয়গান গেয়েছেন।

॥ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ॥

বিজ্ঞান-সাধনার নতুন নতুন দরজা খুলে গেলো এই সময়ে।

এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয় যে মধ্যযুগে বিজ্ঞানের কোনো অগ্রগতিই হয় নি। তবু, এই নবজাগৃতির যুগেই বিজ্ঞানচর্চা পুরোনো ধারাকে ছাড়িয়ে নতুন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথাটাই ধরা যাক না কেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক টলেমি বলে গিয়েছিলেন যে পৃথিবীটাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল, গ্রহনক্ষত্র সব কিছু তাকে ঘিরে ঘুরছে। মধ্যযুগ এ কথাটা মেনে নিয়েছিলো,—বাইবেলের কাহিনীর সঙ্গেও

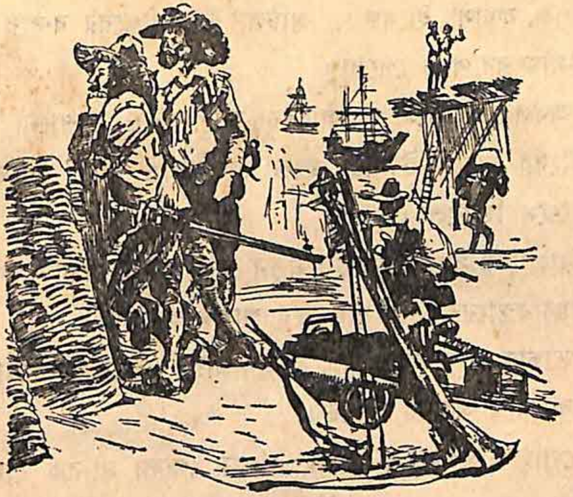
এ কথা মেনে কি না! এদিকে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামে এক পোল্যাণ্ডবাসী পাদরী তাঁর সারা জীবনের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ফল হিসেবে "গ্রহ-নক্ষত্রাদির আবর্তন সম্পর্কে" নাম দিয়ে এক বই প্রকাশ করলেন। এ বইয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য ছিলো যে পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র নয়, সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমাণ একটি গ্রহমাত্র। সারা ইউরোপে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো এ বই: অনেকে সমর্থন করলেন, অনেকে উঠে পড়ে লেগে গেলেন কোপার্নিকাসকে ভুল প্রমাণ করবার জন্যে।

কোপার্নিকাসের পর জার্মান পণ্ডিত কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) তাঁর মতকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করলেন। কিন্তু এ মতকে চূড়ান্তভাবে উপস্থিত করলেন ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)। গ্যালিলিও শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না; পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, বলবিদ্যা ও আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, বিজ্ঞানসাধনার জন্যেই গ্যালিলিওকে বিপদে পড়তে হয়েছিলো। রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিচারে তাঁর মতবাদকে 'অশাস্ত্রীয়' ও 'ধর্মদ্বেষী' বলে ঘোষণা করা হয়; জীবনের শেষ কটা বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছে কর্তৃপক্ষের নজরবন্দী হিসেবে। অবশ্য একশো বছরের মধ্যেই সারা দুনিয়া এই মতবাদকে গ্রহণ করেছিলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জিকার সংস্কার সাধন করা হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে বাস্তব জীবনের তাগিদ আসছিলো

প্রতি মুহূর্তে। কোপার্নিকাসের বক্তব্য, পঞ্জিকার সংস্কারের প্রয়োজন, গুলি-গোলা চালানোর সঠিক দূরত্ব নিরূপণ, দুর্গ বা যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ, বণিক-মহাজনদের সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ই প্রত্যহ নতুন নতুন সমস্যা তুলেছে এবং সে সবের সমাধান হাজির করতে হয়েছে গণিতবিদ্যাকে। এ যুগে গণিত, বলবিদ্যা বা পদার্থ বিদ্যাকে যাঁরা সম্প্রসারিত করেছেন তাঁদের মধ্যে ইটালির টার্টাগ্লিয়া ও কার্ডান, হল্যাণ্ডের ষ্টেভিনাস, স্কটল্যাণ্ডের জন নেপিয়ার, ইটালির পোর্টা, হল্যাণ্ডের জ্যানসেন, ইংরেজ উইলিয়াম গিলবার্ট এবং ইটালির গ্যালিলিওর নাম উল্লেখ করতে পারি। এগ্রিকোলা নামে এক জার্মান ডাক্তার ধাতুবিদ্যার পত্তন করলেন। রসায়ন-শাস্ত্রে হল্যাণ্ডের হেলমন্ট গ্যাস সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব উপস্থিত করেন। তবে রসায়নশাস্ত্রের কাজ বস্তুতপক্ষে শুরু হয় বয়েলের অবদানের মধ্যে দিয়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইংরেজ উইলিয়াম হার্ভে শরীরের ভেতর রক্ত-চলাচলের নিয়ম আবিষ্কার করেন। এ ছাড়াও উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার শুরু হয় ইংরেজ উইলিয়াম টার্ণার, ইটালির সেসালপিনো, ফরাসী চিকিৎসক পীয়ের বৈলন, সুইস্-জার্মান কনরাড্ ফন গেসনার প্রভৃতির কাজের মধ্যে দিয়ে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাস রচনা বা ভাষা চর্চারও কাজ দ্রুত এগোতে থাকে এই সময়ে। অপর যে বিজ্ঞানের বিশেষ অগ্রগতি হয়েছিলো এ যুগে তা হচ্ছে ভূগোলবিজ্ঞান। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বৈজ্ঞানিক মহলে মার্কেটার নামে পরিচিত হল্যাণ্ডের জেরার্ড ক্রেমারের অবদান। অবশ্য ভূগোলের

এ উন্নতির আসল উৎস ছিলো ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ভূপর্যটনের তীব্র নেশা ও একটার পর একটা ভৌগোলিক আবিষ্কার। তারি গল্প এবার শুরু করব।



ইংরেজের ভারতে আগমন

॥ ইউরোপের দিগ্বিজয় ॥

পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ ইউরোপ পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো।

প্রথমত, ধরো, ভারত ও চীনের সঙ্গে যে অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য সেটা চলে গেছে ভীনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালির নগর-রাষ্ট্রগুলির হাতে। তার ওপর, মুসলমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অটোমান তুর্কীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে; এর ফলে দেখা যাচ্ছে মুস্লিমরা বাণিজ্য করার চেয়ে যুদ্ধটাই বেশি চালাচ্ছে। তাতে এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারটা একদিকে যেমন অনিশ্চিত হয়ে গেছে, তেমনি তার মারফত লাভের আশাটাও গেছে কমে।

অতএব, আর পরের ওপর নির্ভর করে থেকো না ; বিষয়টা হাতে নাও। এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের নতুন পথ খুঁজে বার করো। এগিয়ে এলো পোর্টুগাল, স্পেন ; সাড়া দিলো ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ। আটলাণ্টিক সাগরের বন্দরে বন্দরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো।

অর্থলাভের সঙ্গে পুণ্যলাভের ব্যাপারটাও মেশানো হলো। বিধর্মীদের স্বধর্মে টানার জন্যে পাদরীরাও 'ক্রস' হাতে নিয়ে দলে এসে ভিড়লো।

রাজাদের সমর্থন আছে : নতুন দেশ আবিষ্কারের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবিস্তারের মোহ রাজাদের আকৃষ্ট করলো।

তাছাড়া শুধু দক্ষতা নয়, সমুদ্রযাত্রার বিজ্ঞানেও ইউরোপীয়েরা অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে।

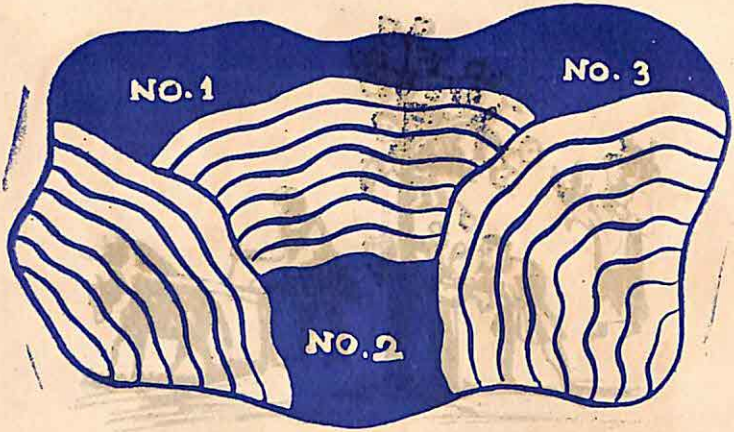
পোর্তুগাল সবার আগে এগিয়ে গেলো নাবিক রাজকুমার হেনরির নেতৃত্বে। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক বার্থলোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণে শেষবিন্দু 'উত্তমাশা অন্তরীপ' আবিষ্কার করলেন। ১৪৯৮ সালের মে মাসে আর-এক জন পোর্তুগীজ ক্যাপ্টেন ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছলেন। এর পরে কিছুদিন অন্তত ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যটা পোর্তুগীজদের একচেটিয়া অধিকারেই চলতে থাকলো।

কলাম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের গল্প হয়তো অনেকেরই জানা আছে। স্পেনের রানীর সাহায্যে ও সমর্থনের ভিত্তিতে ইটালিয়ান নাবিক ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের অভিযান। ১৪৯২





মধ্যযুগের আঁকা দুটি ছবি : ওপরে ভূমিদাসেরা খেতে কাজ করছে। পাশে মধ্যযুগের টঁ্যাকশাল—ধাতুর পাতের ওপর ছাপ মারা হচ্ছে।



ওপরের ছবিতে মধ্যযুগের 'ম্যানর'-এ জমির চাষের ব্যবস্থা। জমি তিন ভাগে ভাগকরা: দু ভাগে দু রকম ফসলের চাষ হতো। কিন্তু তৃতীয় ভাগটি অনাবাদি ফেলে রাখা হতো। কেন? একনাগাড়ে আবাদ করে গেলে জমির ফলন ক্রমশ কমে যায়, কিন্তু এক বছর এমনি ফেলে রাখলে জমির উর্বরাশক্তি আবার ফিরে আসে। প্রত্যেকটি ভাগ অমন ফালি-ফালি করে ভাগ করা কেন? এক-এক ফালি এক-এক কৃষকের অংশ— প্রত্যেক ভাগেই প্রত্যেক কৃষকের এক-ফালি করে অংশ আছে। কিন্তু আর-একটা প্রশ্ন। ধরা যাক, রবার্ট নামে একজন কৃষক। কোন ভাগের কোন অংশ রবার্ট পাবে? হয়তো এমন হতে পারে, প্রথম ভাগের সবচেয়ে মাথার অংশটা, দ্বিতীয় ভাগের মাঝখানের অংশটা, তৃতীয় ভাগের একেবারে নিচের অংশটা। এমন ব্যবস্থা কেন? কারণ, প্রত্যেকটি ভাগের প্রত্যেকটি ফালিই তো আর সমান উর্বরা নয়; কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা না হলে রবার্ট-এর পক্ষে ফাঁকি পড়বার ভয়।



রেনেসাঁসের মানুষ। ওপরে: লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি।
নিচে: বাঁ দিকে ম্যাগেলান, ডান দিকে ইরাস্‌মাস্‌।







কোপার্নিকাস্



গ্যালিলিও

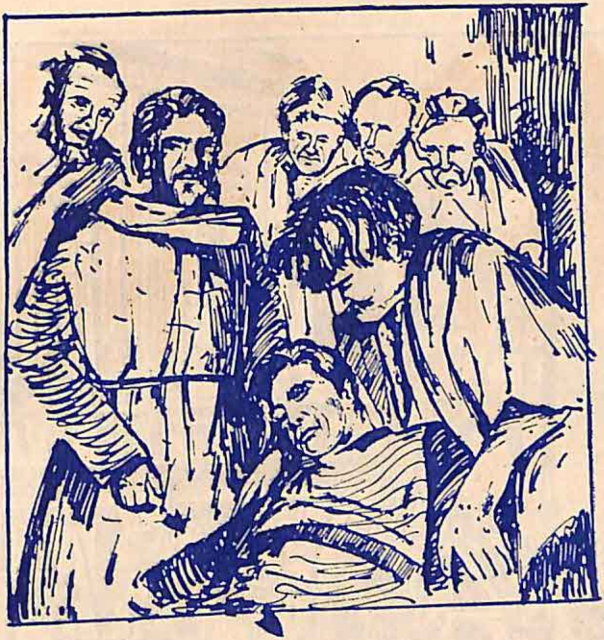
বিজ্ঞানের নবযুগ



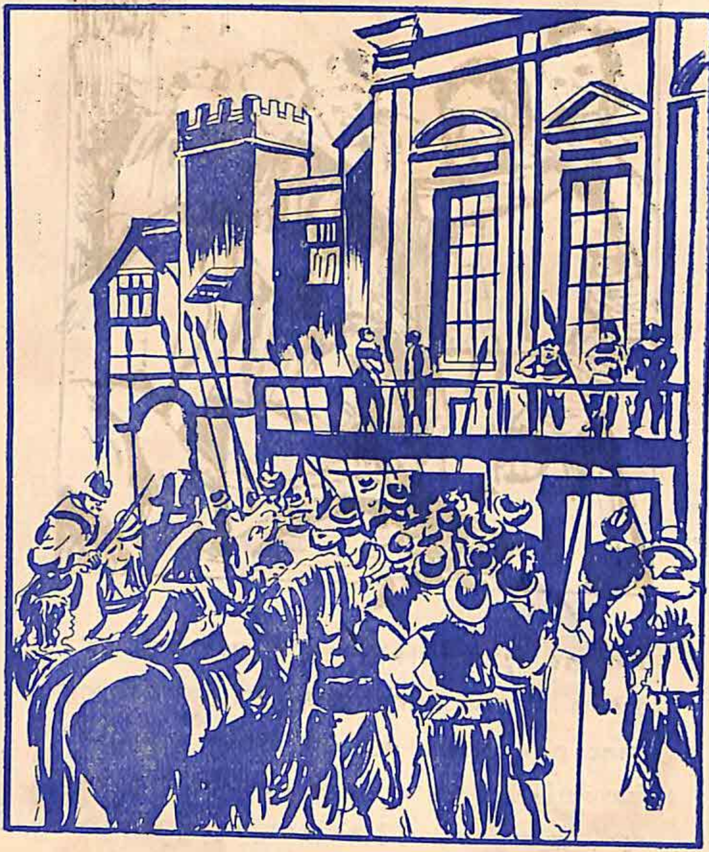
কেপলার্



নিউটন্



ইংল্যাণ্ডের চতুর্দশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহের নেতা ওয়াট্ টাইলার। ১৩৮১ সালের ১৩ই জুন তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষকরা লণ্ডন অভিযান করে এবং ১৪ই জুন রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড প্রতিশ্রুতি জানায় যে সমস্ত ভূমিদাসকে মুক্তি দেওয়া হবে। রাজা কৃষক-নেতা টাইলারের সঙ্গে দেখা করতে চান এই খবর শুনে ১৫ই জুন টাইলার যখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যান তখন অতর্কিতে তাঁকে ছুরি মারা হয়। ছবিটা ছুরিকাবিদ্ধ মৃত্যুমুখী টাইলারের।



প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদনের পূর্বমুহূর্ত। দোতলার বারান্দায় বাঁ দিকে প্রথম মূর্তিটি চার্লস-এর : মৃত্যুর আগে তিনি পাদরি জাক্সনের সঙ্গে শেষ কথা বলে নিচ্ছেন। ডান দিকে জল্লাদ ও প্রহরী অপেক্ষা করছে।



ভল্টেয়ার্



দিদারো

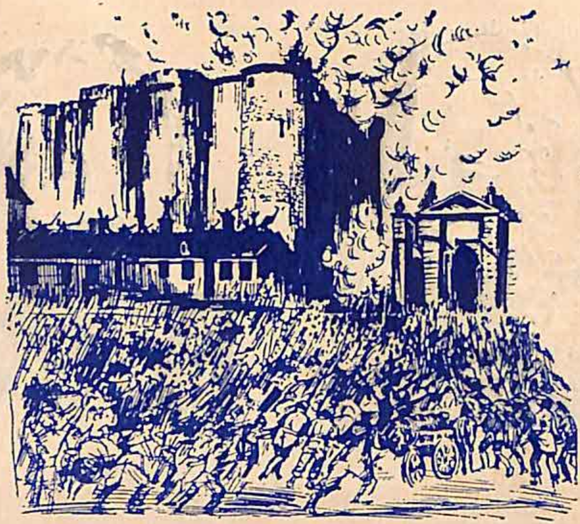
ফরাসী বিপ্লব



রোব্স্পীয়ের্



ড্যাল্টন্



বাস্তিলের পতন

খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে কলাম্বাস স্পেন থেকে রওনা হন। তেত্রিশ দিন অজানা সমুদ্রে ভেসে জাহাজ যখন জমিতে এসে পৌঁছলো, কলাম্বাস ভাবলেন তিনি এশিয়ার তীরবর্তী কোনো দ্বীপে হাজির হয়েছেন। আসলে কলাম্বাস যেখানে প্রথম নোঙর ফেলেছিলেন তা হচ্ছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত ওয়াটলিং দ্বীপ। তাঁর ঐ ভুলের কল্যাণে ঐ মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা আজও বহন করছে 'ইণ্ডিয়ান' বা 'রেড ইণ্ডিয়ান' নাম।

স্পেনের চাকুরে পোর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেলানের কীর্তি ভাস্কো ডা গামা বা ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের সমপর্যায়ের। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচখানা জাহাজ নিয়ে রওনা হন ম্যাগেলান। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বার জলপথ যে প্রণালীটি তিনি আবিষ্কার করেন তা আজও ম্যাগেলান-প্রণালী নামে তাঁরই স্মৃতিকে বহন করছে। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপাইনে এসে পৌঁছন ম্যাগেলান। এখানে দ্বীপবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি মারা যান। তাঁর সাথীরা ১৫২২ সালে স্পেনে ফিরে আসে।

অন্যরাও বসে রইলো না। পোর্তুগাল ও স্পেনের পেছনে পেছনে ইংরেজরাও এসে পতাকা তুললো উত্তর আমেরিকা, ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও ল্যাব্রাডরে। ফরাসীরা এসে আস্তানা গাড়লো উত্তর আমেরিকার পূর্ব-অংশে। ওলন্দাজরাও পেছিয়ে ছিলো না; তবে তারা প্রধানত মনোনিবেশ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাবলীতে।

এই আবিষ্কারগুলোকে কিন্তু কেবল দুঃসাহসিক অভিযান হিসাবে দেখলে চলবে না। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা বা

বাণিজ্যের বিস্তারেই এর পরিণতি নয়। এখান থেকে শুরু হয়ে গেলো এক নতুন পর্যায়। লুণ্ঠন, দস্যুতা, হত্যালীলা ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের নির্মমতায় এই পর্বের ইতিহাস গোটা মানুষজাতের কলঙ্ক।

১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর কলাম্বাস মার্কিনভূমিতে পদার্পণ করলেন। মাটিতে নেমেই তিনি প্রথমে তদ্‌গতচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এবং তারপরেই ঘোষণা করেন এই নতুন দেশের ওপর স্পেনের রাজার আধিপত্য।

কেন? দেশে কি আর কোনো লোক ছিলো না?

ছিলো বৈ কি! কলাম্বাসই তো তাদের ইণ্ডিয়ান বা ভারত-বাসী নাম দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইউরোপীয় মানুষদের সেই সময়ে যুক্তিধারাই ছিলো এই ধরনের। অন্য দেশের মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করতে তারা বড়ো একটা চাইতো না। তারা বুঝেছিলো, তাদের নিজেদের প্রাধান্য, আধিপত্য, সাম্রাজ্য। স্বয়ং পোপ ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত এক দাগ কেটে দিয়ে তার পুব দিককার সমস্ত 'বিধর্মীদের দেশে' বাণিজ্য, উপনিবেশস্থাপন বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব-বিস্তারের এক-চেটিয়া অধিকার দান করেন পোর্তুগালকে এবং সে দাগের পশ্চিম-দিকটায় অনুরূপ অধিকার দান করেন স্পেনকে। অবশ্য পোপের এ দাগ টেকেনি; পরের বছরেই স্পেন ও পোর্তুগাল আপোসে দাগটাকে খানিকটা পাল্টে নিয়েছিলো। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেলো যে এ দাগ ক্যাথলিক ফ্রান্স থেকে

আরম্ভ করে প্রোটেষ্টাণ্ট ইংল্যাণ্ড বা হল্যাণ্ড, কেউই মানতে রাজি নয়। কাজেই শুরু হলো একজনের সঙ্গে আর একজনের আক্চা-আক্চি লড়াই।

সে যাই হোক, আমেরিকায় মানুষ ছিলো। নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে এরা শুরুতে এশিয়া থেকেই গিয়েছিলো। আন্দাজ বিশ-পঁচিশ হাজার বছর ধরে তারা আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে এসেছে; বিশিষ্ট সমাজ-জীবন এবং নিজস্ব সংস্কৃতি তারা গড়ে তুলেছে আমেরিকার বুকে। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতি স্বভাবতই ছিলো অসম। এদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর ছিলো পুয়েবলো, আজটেক, মায়া ও ইঙ্কা, এই চার উপজাতির মানুষেরা।

এই সব অগ্রসর আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানরা বড়ো বড়ো শহর গড়েছে, গড়েছে বিশাল প্রাসাদ, মন্দির ও পিরামিড, সেই সব বাড়ির গায়ে খুদেছে নানা মূর্তি, দেয়ালের গায়ে এঁকেছে নানা ছবি। মৃৎপাত্রের কাজে এদের সকলেরই দক্ষতা অসামান্য। আজটেক ও মায়ারা নিখুঁত সময়পঞ্জী নির্ধারণ করেছিলো। মায়াদের তৈরি মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রে মায়ারা "শূন্য" আবিষ্কার করেছিলো,—যে কীর্তির গর্ব ইউরোপের মানুষ করতে পারে না। আজটেক ও মায়ারা লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো। বইয়ের পাতায় ছবিও আঁকতো তারা। কিন্তু প্রধানত খ্রীষ্টান পাদরীরাই মায়াদের সব বই পুড়িয়ে দিয়েছে। সারা দুনিয়ায় তিনখানি মাত্র বই এই ধ্বংস-লীলার হাত থেকে বেঁচে টিকে আছে আজও। চাষের কাজই

ছিলো এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। উন্নত ধরনের সেচ-ব্যবস্থার কল্যাণে এদের কৃষি-সম্পদ বিকাশলাভ করেছিলো।

এক কথায় বলতে গেলে, সুখে-দুঃখে, নিজেদের সমাজ, সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে, এরা ছিলো নিজেদের দেশে। কিন্তু সেটা একটা বিচারের বিষয়ই ছিলো না তৎকালীন ইউরোপীয়দের চোখে। যে জমি তারা দেখেছে, সেটা তাদেরই। আদিম অধিবাসীদের ভূমিকা হচ্ছে দাসত্বের।

ফ্রান্সিস্কো পিজারোর গল্প শুনবে ?

অশিক্ষিত স্প্যানিশ ছোকরা এই পিজারো, শুয়োর চড়াতো ছোটোবেলায়। সে এলো একদল দুঃসাহসী যোদ্ধা নিয়ে পেরুতে, ১৫৩২ সালের নভেম্বর মাসে। ইঙ্কাদের মধ্যে তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। দুই ভাইয়ের লড়াইয়ে রঙ্কা-রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সময়ে পিজারোর আবির্ভাব।

পিজারো আর ইঙ্কা-প্রধান আটাহুয়ালপার সাক্ষাৎকার ঘটলো ইঙ্কা শহর ক্যাক্সামার্কার একটি পার্কে। কথামতো আটাহুয়ালপার নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় কয়েক হাজার ইঙ্কা এসে জড়ো হয়েছে; আর স্প্যানিয়ার্ডরা এসেছে তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে। সাক্ষাতের প্রথমেই ভালভার্ডে নামে একজন পাদরী আটাহুয়ালপার হাতে একটি বাইব্‌ল দিয়ে বললেন যে তাঁকে নিজেদের ধর্ম ছাড়তে হবে, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং স্পেনের বশ্যতা স্বীকার

করতে হবে। ক্রুদ্ধ আটাহুয়ালপা বাইব্‌লটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন। এবার ফাদার ভালভার্ডে চীৎকার করে পিজারোকে বল্লেন; "দেখছো না, আমরা যতোক্ষণ এই দাম্ভিক কুত্তাটার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করছি, ততোক্ষণে চারদিক ইণ্ডিয়ানে ভরে গেলো? তোমরা কাজে লেগে যাও, আমি তোমাদের পাপ মুক্ত করলাম।"

স্প্যানিয়ার্ডরা কাজে লেগে গেলো! পরে পিজারোর সেক্রেটারি বলেছেন যে সেদিন দুহাজার নিরস্ত্র ইণ্ডিয়ান মারা গিয়েছিলো; ইঙ্কা-ঐতিহাসিক টিটুকুসির মতে মৃতের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি। এ নরবলি সেদিনের মতো ক্ষান্ত হলো আটাহুয়ালপাকে বন্দী করে।

ইঙ্কা-রাজত্ব টলে গেলো। সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত; দূর-দূরান্তের উপজাতিরা বিদ্রোহ করেছে; রাজধানীতে বিরোধী দলের চক্রান্ত চলেছে।

ছাড়া পাবার জন্যে আটাহুয়ালপা মুক্তিপণ দিতে রাজি হলেন। যে ঘরটায় তিনি বন্দী ছিলেন সেটা ২২ ফুট লম্বা, ১৭ ফুট চওড়া। যতোখানি তাঁর হাত যায় ততখানি পর্যন্ত সারাটি ঘর সোনা দিয়ে ভর্তি করে দেবেন তিনি। আর একটু ছোটো আর একখানা ঘর দুবার রুপোয় ভরে দেবেন। কথার খেলাপ হয়নি; প্রায় দশ কোটি টাকার এ মুক্তিপণ তিনি চুকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর উপায়টুকু মাত্র বেছে নেবার সুযোগ তাঁর মিলেছিলো। ফাদার ভালভার্ডে এসে তাঁকে বলেন যে তাঁকে পুড়িয়ে মারারই সিদ্ধান্ত হয়েছে; তবে তিনি যদি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন

তবে ফাঁসিতে মরবার সুযোগ পাবেন। ইঙ্কা-প্রধান আটাহুয়ালপা এই দ্বিতীয় পন্থায় মৃত্যুই বেছে নিয়েছিলেন।

আটাহুয়ালপার মৃত্যুর পরে পিশাচের শাসন চলতে লাগলো পেরুর বুকে। পবিত্র মন্দির লুঠ হতে লাগলো সোনা-রুপোর সন্ধানে। এই লুঠের উন্মত্ততায় গ্রাম-শহরও জ্বলতে লাগলো। পোষা জানোয়ার নষ্ট হলো; ফসলের খামার উঠে গেলো; সেচ-প্রণালী বুঁজে যেতে থাকলো। হতভাগ্য ইণ্ডিয়ানদের ক্রীতদাস বানিয়ে খনিতে পাঠানো হতে থাকলো মাটির বুক কুরে কুরে সোনা-রুপো তুলে আনতে ইউরোপীয় মালিকদের ভোগের জন্যে।

এই তো গেলো মেক্সিকো আর পেরুর গল্প। কিন্তু এই রকমই শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তাক্ত দস্যুতার ভেতর দিয়েই আমেরিকার বুকে ইউরোপীয় সভ্যতার পত্তন হলো। আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানরা প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই করেছে। কিন্তু তারা নিজেদের রাজত্ব বজায় রাখতে পারে নি। লক্ষ লক্ষ ইণ্ডিয়ান মরে সাফ হয়ে গেছে; কিছু কিছু বনে-জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে তাদের প্রাচীন-প্রথা বজায় রেখেছে; সামান্য কিছু অংশকে 'রিজার্ভেশন' বা ইণ্ডিয়ানদের জন্যে ঘেরা জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। অধিকাংশকেই মানতে হয়েছে নতুন ইউরোপীয় ব্যবস্থা। তবু তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার জন্যে পুরো চার শো বছর ধরে লড়াই চালিয়েছে।

অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের পরাজয় হতোই। ইউরোপের উন্নততর সামাজিক বিকাশের কাছে মাথা নোয়ানো ছিলো অবধারিত। অস্ত্র-শস্ত্র, উপকরণ-সম্ভার ও সংগঠন ও শৃঙ্খলায় ইউরোপীয়রা ছিলো

অনেক বেশি অগ্রসর। তার ওপর ইণ্ডিয়ানদের নিজেদের মধ্যে ছিলো অনৈক্য ও যুদ্ধ। এ অবস্থায় জয়-পরাজয় তো পূর্ব-নির্ধারিত। তবু ইউরোপীয় অধিবাসীদের নির্মমতা এক তিক্ত-স্বাদ রেখে গেছে ইতিহাসের পাতায়। এ কথা যেন কেউ মনে না করে যে শুধুমাত্র স্প্যানিয়ার্ডরাই নরমেধযজ্ঞ উদ্-যাপন করেছে আমেরিকার মাটিতে। পোর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, —কেউই পেছিয়ে ছিলো না। এদের সকলেরই মূলমন্ত্র ছিলো : "The only good Indian is a dead Indian" (ভালো ইণ্ডিয়ান বলতে একমাত্র মৃত ইণ্ডিয়ানই বোঝায়)।

এ কথা মনে করবারও কোনো কারণ নেই যে এ লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শুধু আমেরিকার বুকে। ভারতে আর এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশে একই ধরনের নৃশংসতার কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গল্প আর এখানে করলাম না। তোমাদের কাছে তা সুপরিচিত। শুধু সূত্রটুকু বজায় রাখবার জন্যে জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের কয়েকটি লাইন এখানে তুলে দিচ্ছি : "দেশটার কোনো অংশই আপনা থেকে ছেড়ে দেয় নি····সমুদ্রের তীরে নেমে আমাদের মালপত্র বিক্রি করবার অনুমতি দিয়েছিলো প্রথমে ; তারপর ক্রমে ক্রমে কখনও গায়ের জোরে কখনও বা ধাপ্পা দিয়ে আমরা দেশের প্রাচীন রাজাদের আসনচ্যুত করেছি, অভিজাতদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছি এবং জনসাধারণের শ্রমশিল্প ও দ্রব্য-সম্ভারের অবিরাম শোষণে তাদের দেবার মতো বাড়তি সমস্ত সম্পদই আমরা

অধিকার করে নিয়ে থাকি।”

কথায় কথায় হয়তো একটু পরের কথা আগে বলে ফেলেছি। এই সুযোগে ইতিহাসের স্তরগুলো উল্লেখ করে যাই। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা ভারতে আসবার জলপথ আবিষ্কার করার পর এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য পোর্তুগালেরই একচেটিয়া অধিকারভুক্ত হয়। পোর্তুগীজরা ভারত ও ভারতমহাসাগরের দ্বীপাবলীতে ঘাঁটি তৈরি করে বাণিজ্য ও দস্যুতা সমানেই চালাতে থাকে। এরপর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আসরে নামে ওলন্দাজেরা ; সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা গেলো যে পোর্তুগীজ কর্তৃত্ব অন্তর্হিত হয়েছে। ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রাধান্য ওলন্দাজদের। কিন্তু তারা মনোনিবেশ করেছিলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাবলীতে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। এরা মাদ্রাজে এসে বসে ১৬৩৯ সালে, বোম্বাইতে ১৬৬৮ সালে এবং কলকাতার পত্তন করে ১৬৯০ সালে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের কথা তো সকলেরই জানা। ফরাসীরা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিচেরীতে ঘাঁটি করে। পরে ভারতের বুকে ইংরেজ ও ফরাসীর লড়াই ও ফরাসী শক্তির পরাজয়,—সে আর-এক কাহিনী।

এখানে আর-একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ইউরোপীয়রা আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের উৎখাতের পথ নিয়েছিলো। তাদের হত্যা ও উচ্ছেদের ভেতর দিয়ে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো আমেরিকার বুকে। কিন্তু এশিয়াতে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। তার মানে এই নয় যে এশিয়াতে

যারা এসেছিলো তারা ছিলো সহৃদয় বণিক। ভারত-পথের আবিষ্কর্তা ভাস্কো-ডা-গামা দেশে ফেরবার পথে মক্কায় তীর্থযাত্রী একটি জাহাজের ওপর আক্রমণ চালান। শত শত হজযাত্রী-পূর্ণ জাহাজ পুড়তে লাগলো। কোলের শিশু-সন্তান শূন্যে তুলে মায়েরা মিনতি জানিয়েছিলেন ভাস্কো-ডা- গামার কাছে : সে আবেদন ভাস্কো-ডা-গামার হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় : "হার্মাদ"দের (পোর্তুগীজ জলদস্যু) অত্যাচার ইতিহাস-স্বীকৃত। কিন্তু, সে যাই হোক,—ভারতবাসীকেও যে ইউরোপীয়রা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের মতো উচ্ছেদ করতে পারলো না, তার কারণ হলো এদেশের জনসংখ্যা ও উন্নততর সভ্যতা। এই যুগের সমগ্র এশিয়ার এবং বিশেষ করে ভারতের সভ্যতার বিশদ বর্ণনা এখানে দিলাম না এই জন্যে নয় যে তাকে ছোটো করে দেখছি। এর আগে হিন্দু, মুসলিম বা চীনা সভ্যতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ; এই যুগে অগ্রগতি যা তা পূর্ব-বর্ণিত সভ্যতার চৌহদ্দির মধ্যেই। মৌলিক পরিবর্তন তখনও আসেনি এখানে,—যেমন এসেছিলো ইউরোপে। তাই আমেরিকার দশা না হলেও, ধীরে ধীরে এশিয়াকেও ইউরোপের কর্তৃত্ব মানতে হলো : আর তার মানে শুধুই ইউরোপের কূটবুদ্ধি, কপটতা ও হিংস্রতার কাছে এশিয়ার পরাজয় নয়, পরাজয় ইউরোপের নতুন অর্থনীতি ও সামাজিক শক্তির কাছেও।

॥ নতুন বাণিজ্য ঃ পণ্য—মানুষ ॥

অল্প দিনের মধ্যেই ইউরোপীয়রা দেখতে পেলো যে আমেরিকান

ইণ্ডিয়ানদের সোনার ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। তখন চোখ গেলো আমেরিকার আসল সম্পদের দিকে। দেখতে দেখতে নতুন নতুন কারবার খোলা হতে আরম্ভ করলো। চালু হলো খনি; খোলা হলো বাগিচা; শুরু হলো গোপালন। কিন্তু এও স্পষ্ট যে মানুষের পরিশ্রমের আগুনে গালিয়ে না নিলে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সোনা মেলে না। সেই খাটবার মানুষ আসে কোথা থেকে?

প্রথমে নজর পড়লো আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের ওপর।

ইউরোপীয়রা এদের মানুষ বলে গণ্য করতো না। হাজারে হাজারে আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের দাস হিসেবে খনি বা বাগিচার অমানুষিক পরিশ্রমের কাজে লাগানো হতে থাকলো।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই হিসেবের গলতি ধরা পড়লো। ভালো দাস এদের কখনই বানানো গেলো না।

এরা পালিয়ে যেতো; এরা বিদ্রোহ করতো; আর কোনো উপায় না থাকলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এরা মুক্তি খুঁজে নিতো। লক্ষ লক্ষ ইণ্ডিয়ান উজাড় হয়ে যেতে লাগলো। অবস্থা এতোদূর খারাপে দাঁড়িয়েছিলো যে ইণ্ডিয়ানদের দাস বানানোর বিরুদ্ধে আইন পাশ করতে হয়। ইণ্ডিয়ানদের দরদে নয়; খাটবার মানুষই যদি না থাকে তবে সব ব্যবসা মাটি, স্রেফ এই আশঙ্কা থেকেই এ আইনের উদ্ভব। যাই হোক, আইনের ভয়ে নয়, কারণ আইনকে কী করে ব্যবহার বা উপেক্ষা করতে হয়, সব দেশের মালিকদেরই তা ভালো জানা আছে,—আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের শ্রমশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্যেই সরাসরি দাস না বানিয়ে আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে অন্য পথ ইউরোপীয়

মালিকরা নিলো। কোথাও ভূমিদাসপ্রথার রকমফের, কোথাও বা ঋণের দায়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে অর্ধ-দাস বানিয়ে রাখার ব্যবস্থাই চালু হলো। ইণ্ডিয়ানদের ওপর ইউরোপীয় মালিকদের নির্মম অত্যাচার ও তাদের মরণপণ বিদ্রোহের কাহিনী রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

ইউরোপের দাস-ব্যবসায়ীরা ভালোবেসে আফ্রিকার নিগ্রোদের নাম দিয়েছিলো 'কালো মানিক' ("ব্ল্যাক্ আইভরি")" আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে হাতি শিকার করে তার দাঁত বিক্রি করা যেমন লাভের ব্যবসা, তার চেয়েও লাভের ব্যবসা ছিলো আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে আমেরিকার খনি-মালিক বা বাগিচা-মালিকের কাছে বিক্রি করে দেওয়া। লাভের খাঁই তো মেটাতেই হবে। কাজেই আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান দিয়ে যদি না পোষায়, তবে ধরে নিয়ে এসো আফ্রিকার নিগ্রোদের। এরা আরও পরিশ্রমী, আরও কষ্টসহিষ্ণু ; যাযাবর ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে উন্নততর সংস্কৃতির মানুষ হওয়ার ফলে চাষবাসের কাজে আরও বেশি পটু। আরও সুবিধে, বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্বতে দেশোয়ালী ভাই-এর দল লুকিয়ে নেই এদের বিদ্রোহে সাহায্য করবার জন্যে। কাজেই মার্কিন-বাজারে নিগ্রোদের দর হু হু করে চড়ে গেলো।

কিন্তু নিগ্রোদের দাস করাই বা সম্ভব হতো কী করে?

সার জন হকিন্সের গল্পটি এখানে করা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক রঙদার চরিত্র এ ভদ্রলোকটি। তিনি একাধারে নৌসেনানায়ক ও জলদস্যু, বণিক ও দাসব্যবসায়ী। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিয়েরা লিওনের এক নিগ্রো-গ্রামে তিনি

সরাসরি আক্রমণ চালান কিছু দাস-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। লাভ কিছুই হলো না ; বিষাক্ত তীরের ধাক্কায় সদলবলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হলো। কিন্তু ঠেকে শেখার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিলো। কাজেই তাঁর নিগ্রো-শিকারের দ্বিতীয় অভিযানে আর একলা বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন না। প্রথমে একটা উপজাতির সঙ্গে মিতালি পাতালেন ; তারপর এদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে এদের সহায় হিসেবে উপস্থিত হয়ে সেই শত্রুপক্ষ থেকে দাস সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। আফ্রিকার বুকে দাস-ব্যবসায় কায়েম হয়ে বসলো। নিগ্রোদের মধ্যে উপজাতির সঙ্গে উপজাতির নিরন্তর দ্বন্দ্ব ও দাস-ব্যবসায়ীদের সুচতুর বিভেদনীতি, এই হলো নিগ্রোদের নিয়ে দাসব্যবসায়ের সাফল্যের কারণ।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দাস-ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি বসলো। নিগ্রো উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ বেড়ে গেলো বহুগুণ। যুদ্ধে যুদ্ধে মারা গিয়ে এবং দাসব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ে, আফ্রিকার জনবল নিঃশেষ হতে থাকলো। বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ কুচিন্স্কি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে আমেরিকায় দাস হিসেবে প্রায় দেড় কোটি নিগ্রো আমদানি করা হয়েছিলো। ঐতিহাসিক ডু বোয়া বলেন যে আমদানিকরা প্রত্যেকটি নিগ্রো পিছু আফ্রিকার রণক্ষেত্রে অথবা সমুদ্র পার হবার সময়ে দাস-ব্যবসায়ীর জাহাজে অন্তত পাঁচটি করে নিগ্রো মারা গেছে। অর্থাৎ, আফ্রিকার নীট লোকসান ন কোটি মানুষ।

ক্রীতদাস আমদানির জন্যে যে জাহাজগুলো ব্যবহার করা হতো তার তুলনায় নরকও বোধ হয় আরামের জায়গা।

জাহাজের খোঁদলের মধ্যে খালি কাঠের ওপর ৬ ফুট লম্বা আর ১৬ ইঞ্চি চওড়া জায়গায় প্রত্যেকটি দাসকে শুতে হতো। চাবুক মেরে একজনের গায়ে ঠেসে আর একজনকে শুতে বাধ্য করা হতো। সমস্ত সারি একসঙ্গে পাশ না ফিরলে কোনো একজনের আলাদা করে পাশ ফেরা সম্ভব ছিলো না। ঝড় উঠলে দরজা-জানালা বন্ধ করা হতো; ঝড় চলে গেলে দেখা যেতো যে বেশ কিছুসংখ্যক দাস মরে পড়ে আছে বিশুদ্ধ হাওয়ার অভাবে। এক-একটা যাত্রায় শতকরা বিশ-ত্রিশ ভাগ নিগ্রোর মৃত্যু প্রায়ই ঘটতো। তার ওপর জলের অভাব ঘটলে বা শত্রুজাহাজের আক্রমণ থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে গেলে, অনেক সময় মাঝ-সাগরে নিগ্রোদের ফেলে দিয়ে জাহাজ হাল্কা করা হতো। অবশ্য এতো লোকসান সত্ত্বেও প্রত্যেক যাত্রাতেই শতকরা হাজারকরা মুনাফা ছিলো নিশ্চিত।

এখন চমৎকার লাভের ব্যবসা যে প্রধানত কাদের হাতে ছিলো তা বলা বড়ো মুশকিল। কারণ, ওলন্দাজরা এ দিক থেকে বেশ নাম করেছিলো। কিন্তু ফরাসী বা পোর্তুগীজরা কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিলো বলে মনে হয় না। আবার ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনেকে যদিও বলে থাকেন যে ইংরেজরা দাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ছিলো, তবু এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে ছিলো ইংরেজরাই। নিগ্রোদাসদের হাড়ে মাসে গড়ে উঠেছে বিলেতের ম্যাঞ্চেস্টার বা লিভারপুল বন্দরের ঐশ্বর্যের অনেকখানি। জন হকিন্‌স্ সাহেবকে মনে আছে? তিনি "সার" উপাধি পান তাঁর

দাসব্যবসায়ে দ্বিতীয় অভিযানে বাহাদুরির জন্যে। মহারানী প্রথম এলিজাবেথ হকিন্‌সের লাভের পরিমাণ দেখে ভবিষ্যতে তাঁর ব্যবসাতে অংশীদার হতে চান। সেজন্যে দাস-ব্যবসায়ী হকিন্‌স্‌কে তিনি একটি জাহাজ ধার দিয়েছিলেন। জাহাজের নামকরণ হয়েছিলো : "যীশু"।

নিগ্রো-দাসদের কী অবস্থায় থাকতে হতো তার গল্প ফলাও করে বলার আমার দরকার নেই। হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো-র লেখা "টমকাকার কুটীর" বাঙলা ভাষাতেই পাওয়া যায়। দুএকটি কথার উল্লেখমাত্র করে যাচ্ছি। সারাটা দেশে বুড়ো ক্রীতদাস বড়ো একটা পাওয়া যেতো না। কারণ, বুড়ো দাসকে খাইয়ে পরিয়ে পোষার চেয়ে যুবক, কর্মঠ দাসকে খাটিয়ে মেরে ফেলাটাই বেশি লাভের ছিলো। একটা নিগ্রোকে চুরি করাটা আইনের চোখে অপরাধ ; কিন্তু তাকেই শাস্তি দিতে গিয়ে মেরে ফেলাটা অপরাধ নয়।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম অনুযায়ীই বারবার প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও নিগ্রো অভ্যুত্থান ঘটেছে আমেরিকার বুকেই। এর চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে হাইতির বীর নেতা তুসোর নেতৃত্বে সফল বিপ্লব। যাঁরা বলে এসেছেন যে নিগ্রোরা খুশি মনে দাসত্বকে মেনে নিয়েছে, তাঁরা সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেছেন, ইতিহাসকে বিকৃত করে এসেছেন।

আর-একটি কথা মনে রাখা দরকার। ক্রীতদাস শুধু কালো বা লাল চামড়ার মানুষই ছিলো না ; সাদা চামড়ার খাঁটি ইউ-রোপীয় সাহেবদেরও ক্রীতদাস বানানো হতো। জোগাড় করার

কায়দাটা ছিলো এই রকম : প্রথমে ঢক্কা-নিনাদ-সহযোগে প্রচার করা হতো যে আমেরিকা দেশটা হচ্ছে স্বর্গরাজ্যবিশেষ। গরিব ইউরোপীয়রা যখন দেশ ছেড়ে যেতে গিয়ে দেখতো জাহাজ ভাড়ার পয়সা নেই পকেটে, তখন তাদের বলা হতো যে যদি তারা সাত বছর গতরে খেটে দিতে রাজি থাকে, তবে বিনা ভাড়াতেই তাদের আমেরিকায় পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজি হয়ে একবার চুক্তিপত্রে সই করলে সাত বছরের জন্যে তার সঙ্গে আর নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে তফাত কিছুই থাকতো না। এই সাত বছরে কোনো অপরাধ করলে দাসত্বের আইন অনুযায়ী সাজা হতো এবং দাসত্বের মেয়াদও বাড়ানো যেতে পারতো।

এ কাহিনীর জাল এবারে গুটিয়ে আনি। কিন্তু ইউরোপের বুকে যে নতুন অর্থনীতি ও নতুন সমাজ জন্ম নিচ্ছে, সে ব্যাপারে দাসপ্রথার ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু না বলে গল্প শেষ করা চলে না। কারণ, আমেরিকায় সোনা ও রুপো আবিষ্কার, আমেরিকার আদি-বাসীদের নির্মূল করা, দাস বানানো, খনির গর্তে পোরা, ভারত ও পূর্ব-ভারতের দ্বীপাবলীতে লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ; আফ্রিকাকে ব্যবসার জন্যে কালো-চামড়া শিকারের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করা,—এই সবের মারফতই ঘটেছে প্রাথমিক অর্থ-সঞ্চয়,—যে টাকাটা না থাকলে বড়ো কায়দায় ফ্যাক্টরি খুলে ব্যবসা চালানো সম্ভব হতো না। আবার দাসব্যবসা না থাকলে আমেরিকার তুলো আসতো না ; তুলো না এলে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা গড়ে উঠতো না। কারণ, দাস ব্যবসাই উপনিবেশগুলোকে তাদের মূল্য দিয়েছে। উপনিবেশগুলো থেকেই বিশ্ব-বাণিজ্য

শুরু হয়েছে আর বিশ্ব-বাণিজ্য থেকেই শুরু হয়েছে আধুনিক বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান। আধুনিক অর্থনীতির বিকাশে দাস ব্যবসার এই ভূমিকা ভুললে চলবে না।

॥ কৃষক-বিদ্রোহ ও ধর্ম-বিপ্লব ॥

মধ্যযুগের ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ছিলো সর্বব্যাপক,—ক্ষমতা ছিলো অপরিসীম। সারা ইউরোপের সব চেয়ে বড়ো সামন্তবাদী জমিদার ছিলো এই রোমান ক্যাথলিক চার্চ,—সারা ইউরোপের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক জমি ছিলো এই চার্চের কবলে ; এবং এই চার্চের জমিদারির শোষণ ও দাপট অন্য কোনো অংশের চেয়ে কম ছিলো না। তার উপর পোপের রাজস্ব হিসেবে সমস্ত দেশ থেকে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ গিয়ে জমতো রোমে। চার্চের দখলদারির ভেতরে রাজাদের কর্তৃত্ব চলতো না ; এদের নিজেদের করপ্রথা, নিজেদের বিচার ব্যবস্থা,—সবই স্বতন্ত্র ছিলো। চার্চের মতামত চাল-চলনও নতুন ব্যবসায়ী-ধনিকসমাজের সঙ্গে টক্কর লাগাতো। কাজেই এই ষোড়শ শতাব্দীতে এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে যখন রাজা, ধনিক-বণিক, জমিদার, কৃষক, সবাই মিলে মিলিত আঘাতে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে স্থানচ্যুত করবে।

ষোড়শ শতাব্দীর আগেও বহুবার চার্চের এই সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আঘাত এসেছে।

অর্থোডক্স চার্চ ও ক্যাথলিক চার্চের বিভেদের কথা আমরা আগেই বলে এসেছি। আর্মেনিয়া ও মিশরে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী

থেকেই আলাদা জাতীয় চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। তাছাড়া সারা মধ্যযুগ ধরেই "পূত রোমান সাম্রাজ্যের" সম্রাটের সঙ্গে বা বিভিন্ন দেশের রাজার সঙ্গে পোপের লড়াই চলেছে,—ক্ষমতার লড়াই।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অন্য কারণও ছিলো।

তখনকার দিনে ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন সব কিছু জুড়েই তো রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত অর্থাৎ, চিন্তা-জগতে সামন্তবাদী সমাজকে ধারণ করে রেখেছে এই ধর্ম। কাজে কাজেই সমাজকে বদলাতে যে চাইবে, তাকে রোমান ক্যাথলিক মতকে ঘা মারতেই হবে। তা না হলে মনের সংস্কারই হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড়ো বাধা পরিবর্তনের পথে। সেইজন্যে সারা মধ্যযুগ জুড়ে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রূপ নিয়েছে কখনও দুর্জ্ঞেয় যোগতত্ত্বে, কখনও বা খোলাখুলি মতপার্থক্য ঘোষণায়, আর কখনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানে।

শহুরে মধ্যবিত্ত,—ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণীরা, সাধারণ সামন্তবাদী প্রভুদের হাত থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলো। কাজেই এদের ভেতর থেকে যে ধরনের "হেরেসি" (মতপার্থক্য) দেখা দিলো তা প্রধানত ধর্মের বিশেষ কতকগুলি বিশ্বাস বা রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিয়েছে যে মতপার্থক্য উঠেছে চাষী এবং সর্বনিম্ন স্তর থেকে। ধর্মের পরিবর্তন দাবি করার সাথে সাথে তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন দাবি করেছে।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজ জন ওয়াইক্লিফ-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড ; সারাটা দেশ পোপের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। ইংল্যাণ্ডের আইনসভা পার্লামেণ্টে অভিযোগ উঠেছে যে রাজার খাজনার চেয়ে চারগুণ খাজনা বেরিয়ে যাচ্ছে পোপের কাছে। তার ওপর ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তখন ফ্রান্সের যুদ্ধ চলেছে, আর পোপ হেলেছেন ফ্রান্সের পক্ষে। ফলে, সবাই আগুন পোপের নামে। এই অবস্থায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াইক্লিফ বলতে আরম্ভ করলেন যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের খাতিরে চার্চের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। চার্চের ভেতরকার অনেক কেলেঙ্কারি তিনি খোলাখুলি ফাঁস করে দিলেন। তিনি বলতেন, পাদরীদের দারিদ্র্য বরণ করা উচিত, খ্রীষ্টের মতো সরল জীবনযাপন করা দরকার।

ওয়াইক্লিফ প্রভুশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালান নি। ফলে, রোমান ক্যাথলিক চার্চের তীব্র বিদ্বেষ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন রাজ-দরবার, বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শহরের বণিকশ্রেণীর কৃপায়। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কিন্তু শুধু চার্চের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার কথাতেই ব্যাপারটা থেমে রইলো না। বরং দেখা গেলো, লোলার্ড নামে পরিচিত সবচেয়ে গরিব তাঁতিদের ভেতর থেকে শুরু করে ধর্ম ও অর্থনীতির সংস্কারের একটা দাবি ছড়িয়ে পড়ছে। এরা বলতে শুরু করেছে, চার্চ ও বড়োলোকদের সকলের সমস্ত সম্পত্তিই সর্বসাধারণের হওয়া দরকার।

এই সময়কার ইংল্যাণ্ডের অবস্থাটা দু কথায় বলে নেওয়া যাক। ১৩৪৭ সালে প্লেগের দাপটে ইংল্যাণ্ডের খাটবার লোক খুবই কমে গেছে। ফলে, শ্রমিকের মাইনে বাড়বার কথা। অথচ ১৩৪৯ সালে আইন করে পুরোনো মাইনের হারই জবরদস্তি করে বজায় রাখা হলো। এদিকে কিছুদিন আগেও যে সব সামন্তপ্রভুরা শারীরিক পরিশ্রম মাফ করে দিয়ে টাকায় খাজনা নিতে আরম্ভ করছিলো, তারা আবার চাষীদের জোর করে খাটিয়ে নিতে শুরু করলো আবার কোথাও কোথাও ভেড়ার লোমের ব্যবসাতে মুনাফা বেশি আসে বলে চাষের জমি বাতিল করে সেখানে ভেড়া চড়ানো আরম্ভ করলো অনেক সামন্ত মালিক। মানুষকে সবচেয়ে বেশি যা খেপিয়ে তুললো তা হচ্ছে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের "জিজিয়া-কর"। বড়োলোকদের অল্পে-স্বল্পে রেহাই দিয়ে গরিবদের ঘাড়ে চেপে বসলো ভালো করে এই করভার।

ফলে যা হবার তাই হলো।

কেণ্ট জেলার এক পাদরী, জন বল,—মালিকরা তাঁর নাম দিয়েছিলো "পাগলা পুরুত"—ঘোষণা করলেন 'ভদ্রলোক আর গরিবদের পার্থক্য যতোদিন না ঘুচছে, ততোদিন ইংল্যাণ্ডের মঙ্গল নেই।' লোকে মুখে মুখে ছড়া কাটতে শুরু করলো ঃ

When Adam delved and Eve span
Who was then the gentleman?
আদমের কাজ মাটি খোঁড়া, ঈভের সুতো কাটা
সেদিন কোথায় পাবে বলো ভদ্রলোকের ব্যাটা?

১৩৮১ সালে চারিদিকে কৃষক-বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেলো।

সবচেয়ে তীব্রতা দেখা গেলো কেণ্ট জেলায়। ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে চাষীরা এগোতে লাগলো জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে, নথিপত্র পুড়িয়ে, "আইন-বিশারদদের" ফাঁসিতে ঝোলাতে ঝোলাতে। লণ্ডনের সিংহদ্বার খুলে দিলো লণ্ডনের কারিগররা, ১৩ই জুন বিদ্রোহীদের দখলে এলো শহর। রাজার কোষাধ্যক্ষ ও ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপকে ধরে ফাঁসি দিলো, কারণ "জিজিয়া কর" বসানোর পাণ্ডা ছিলো এরাই। রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড এবার পুরোনো সমাজের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেখা দিলেন। ১৪ই জুন তিনি ঘোষণা করলেন যে ভূমিদাস-প্রথা থেকে সবাই মুক্তি পেয়ে গেলো। এ আশ্বাসে বহু চাষী ঘরে ফিরে গেলো। ১৫ই জুন খোলা ময়দানে দু দলের সাক্ষাৎ। রাজার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন একা ওয়াট টাইলার। রাজার পার্শ্বচরেরা হঠাৎ তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় এবং আত্মরক্ষার অবকাশমাত্র না দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। ক্ষিপ্ত কৃষকদের সামনে একলা রাজা গিয়ে তাদের মিষ্টিকথায় শান্ত করেন।

ওয়াট টাইলারের মৃত্যুর পর কিন্তু চাকা ঘুরে গেলো। রাজার সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাক্সবন্দী রয়ে গেলো। আবার শুরু হলো লুট, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা,—এবার এ অভিযান পরিচালিত হলো রাজার নেতৃত্বে—চাষীদের বিরুদ্ধে। পাদরী জন বল ও অন্যান্য বহু কৃষকনেতাকে হত্যা করা হলো।

বেচারা ওয়াইক্লিফ! ১৪১৫ সালে কনষ্টান্সের পাদরী-সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কবর থেকে তাঁর মৃতদেহ তুলে এনে পোড়ানো হয়। তাঁর অপরাধ এই যে তাঁর মতামত রাজ্যের

সীমান্তরেখা ছাড়িয়ে মধ্য ইউরোপের বোহেমিয়ায় বিদ্রোহ ছড়ালো। সেখানে এই চিন্তাধারার মুখপাত্র হলেন জন হাস্। ১৩৬৯ সালে সম্পন্ন চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বেথেলহেম গীর্জার পাদরী ছিলেন তিনি। তিনি খোলাখুলিভাবে ওয়াইক্লিফের মত সমর্থন করতে লেগে গেলেন। তাছাড়াও চার্চের আরও কিছু কুকীর্তি ও মতামতের বিরোধিতা তিনি করেন। ফলে, ৬ই জুন, ১৪১০ সালে তাঁকে ধর্মদ্বেষী বলে একঘরে করা হয়। পরে ১৪১৪ সালে কন্‌ষ্টান্সের পাদরী-সংসদে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি মত পরিবর্তন করতে রাজি না হওয়াতে, ধর্মবিদ্বেষের অভিযোগে ৬ই জুন, ১৪১৫ সালে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়।

কিন্তু মানুষকে পুড়িয়ে মারা সম্ভব হলেও আদর্শকে পুড়িয়ে মারা যায় না। সারা বোহেমিয়ায় হাসের নামে এক ব্যাপক লড়াই শুরু হলো। এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য পোপের ক্ষমতা খর্ব করা, চার্চের সংস্কার সাধন করা এবং জার্মানির শাসন থেকে মুক্তি লাভ করা। কিন্তু হাসপন্থীদের মধ্যে দুটো ভাগ ছিলো; বড়োলোকদের দল পাদরীদের জমি ও সম্পত্তি দখল করেই খুশি হয়ে গেলো। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত, শহরের মজুর আর চাষীরা চরমপন্থী মতের অনুসরণ করলো। ট্যাবর শহর হলো এর কেন্দ্র। এই শহরকে ঘিরে এরা এক সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুললো। এ সাম্যবাদ অবশ্য ভাগবাঁটোয়ারার দিকেই নিযুক্ত ছিলো। এদের সৈন্য ছিলো, শৃঙ্খলা ছিলো, শিক্ষার দিকে নজর ছিলো। একপুরুষ

অন্তত বাইরের অনেক আঘাত সয়ে এরা টিঁকে ছিলো। ১৪৩৪ সালের ৩০শে মে তারিখে যুদ্ধক্ষেত্রে এরা হেরে যায়; ১৮০০০ সৈন্যের মধ্যে ১৩০০০ মারা যায়। শান্তিচুক্তিতে ট্যাবরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই সাম্যবাদী সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হাঙ্গারির কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে ১৫১৪ সালে।

এ সময়ে পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডস বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং বিখ্যাত যোদ্ধা গিঅর্গি দোজ্সাকে সেনানায়ক নির্বাচিত করেন। বিশ দিনের মধ্যে দোজ্সা ষাট হাজারের এক সৈন্যবাহিনী বানিয়ে ফেললেন সাধারণ মানুষের থেকে। সামন্তপ্রভুদের এতে আঁতে ঘা লাগলো। তারা পেছনে এসে যে যার ভূমিদাসদের টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। এবার দোজ্সা এবং সাধারণ পাদরীরা মিলিতভাবে চাষীদের বিদ্রোহ করতে ডাক দিলেন।

বিদ্রোহী নেতারা ঘোষণা করলেন যে যারা চাষীদের দেহ ও আত্মাকে বন্দী করে রাখতে চেষ্টা করে তারা হলো অপরাধী। এদের দুর্গ-প্রাসাদ ধ্বংস করতে হবে, আধিপত্য চূর্ণ করতে হবে। বহুদিন যাবৎ দোজ্সার নেতৃত্বে এ বিপ্লবী যুদ্ধ চলতে থাকে। দোজ্সা রাজতন্ত্র ও বিত্তশালীদের প্রভুত্বের অবসান ঘোষণা করে এক লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমস্‌ভারের যুদ্ধে দোজ্সার পরাজয় হয়।

এইভাবে একের পর এক আঘাতের ভেতর দিয়েও রোমান ক্যাথলিক চার্চ তার একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে চলছিলো। কিন্তু এ প্রভুত্বে চূড়ান্ত ভাঙন এলো ষোড়শ শতাব্দীতে।

উপলক্ষ্য এলো, চার্চের টাকা মারবার এক পুরোনো ফিকিরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে। এ ব্যাপারটার নাম "ইন্‌-ডাল্‌জেন্স" বা "করুণা-ভিক্ষা।" কেউ যদি পাপ করে অনুতপ্ত হয়, ভালো কাজ করে, তবে তার পাপমোচন হবে বৈ কি ! স্বর্গের দুয়ার কিছুটা ফাঁক হবে ! এ অবস্থায় যেহেতু সন্ত পিটার স্বর্গের চাবিকাঠিটি পোপের হাতে দিয়ে গেছেন, তাই এ বিষয়ে সেরা নিদান দিতে পারবেন পোপ স্বয়ং। আর পোপের ভাণ্ডারে অর্থ-দান করার চেয়ে "ভালো কাজ" আর কী হতে পারে। কাজেই পোপের সই-করা এক টুকরো কাগজই লোকে হাত পেতে নিতো স্বর্গের "পাসপোর্ট" (ছাড়পত্র) পাওয়া গেলো বলে। আর এই কাগজ বিক্রির কাজে কুশলী লোক পাঠাতে পারলে কাগজ বিক্রির টাকাও আসতো মোটা রকমের।

টেটজেল নামে এই রকম একজন লোককেই পোপ পাঠা-লেন জার্মানিতে টাকা তোলবার জন্যে। আর এর কর্মচাতুর্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মার্টিন লুথার ৯৫-দফা এক বিবৃতি ভিটেনবার্গ গীর্জার দেওয়ালে লটকে দিয়ে এলেন ; ১৫১৭ সালের অক্টোবর মাস সেটা।

বরফজমা পাহাড়ের ওপরে অনেক সময়ে ছোট্ট একটা পাথর গড়িয়ে পড়লে দেখা যায় বিপর্যয় শুরু হলো, বড়ো বড়ো বরফের চাঁই নামতে শুরু করেছে। এখানেও অনুরূপ ঘটনা ঘটলো।

মার্টিন লুথার বিপ্লব ঘটাতে চান নি। ১৪৮৩ সালে গরিব জার্মান পরিবারে জন্ম তাঁর। স্বভাবে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, জেদী, তার্কিক ও কটুভাষী ছিলেন তিনি। ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করে

তিনি সাধু হন এবং পরে ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৫১১ সালে তিনি রোমে যান পুণ্যার্থী সাধু হিসেবেই। কিন্তু ১৫১৭ সালে তিনি "ইনডালজেন্সের" যে বিরোধিতা ঘোষণা করলেন, তার থেকেই শুরু হলো লড়াই! লুথারের মত লোকের মুখে মুখে চালু হতে লাগলো। ১৫১৯ সালে এক তর্কসভায় লুথার যা বললেন সেই মত প্রকাশ করবার জন্যে একশো বছর আগে হাসকে পুড়ে মরতে হয়েছিলো।

লুথারের মত উত্তর জার্মানিতে ছড়িয়ে গেলো। পুণ্যকামীরা চার্চের সংস্কার দেখতে পেলো; রাজা-রাজড়ারা চার্চের সম্পত্তি পেলো; বণিকরা ক্যাথলিকবাদের কড়া অনুশাসন থেকে নিস্তার পেলো; দেশপ্রেমিকরা রোমান পোপের হাত থেকে মুক্তির স্বাদ পেলো।

এবার চাষীরা এগিয়ে এলো তাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে। ১৫২৪ সালে এক বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ রূপ নিলো। এ বিদ্রোহের সেরা নেতা ছিলেন টমাস মুনজার। দেশ থেকে দেশান্তরে তাঁকে পালাতে হয়েছে তাঁর বিপ্লবী মতামতের জন্যে। কিন্তু যেখানে গেছেন সেখানেই তিনি গরিব চাষী আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছেন বিপ্লবী মনের আগুন। জার্মান সামন্ত রাজাদের যে অস্ত্রধারণ করবার জন্যে মার্টিন লুথার ডাক দিয়েছিলেন, সে অস্ত্র এবার চাষীরা ধরলো।

বারো-দফা যে দাবি-পত্র চাষীরা দিয়েছিলো তা পড়লে বোঝা যায়, যে দাবি তাদের ছিলো খুব পরিমিত, সংযত। ভূমিদাস-প্রথার অবসান, মাছ ধরা বা শিকার করার অবাধ অধিকার,

পরিশ্রমের জন্যে টাকায় মাইনে পাওয়া, খাম-খেয়ালী শাস্তি দেওয়া বন্ধ করা,—এই সবগুলোই ছিলো প্রধান দাবি। কিন্তু এ দাবি মানা হয় নি।

নিজের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অস্ত্র ধরা নিশ্চয়ই ন্যায়-সঙ্গত হয়েছিলো: কিন্তু চাষীদের উদ্দেশে প্রথমে লুথার উপদেশ দিলেন যে ধর্মের জন্যে তরবারি-ধারণ ঠিক নয়, বাক্য-ব্রহ্ম তো নিজের শক্তিতেই জগৎ জয় করেছে। এ উপদেশ সত্ত্বেও চাষীদের অভিযান যখন থামলো না তখন তিনি রাজা-রাজড়া সামন্ত-সরদারদের ডেকে বল্লেন: যে যেখানে পারো ওদের মারো; তলোয়ার হোক, ফাঁসির দড়িতে হোক, প্রকাশ্যে বা গোপনে হোক, ওদের হত্যা করো।—ঈশ্বরের কৃপাবঞ্চিত ওরা, ওদের করুণা যে করবে সে নিজেই বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

১৫৯৫ সালে এ বিদ্রোহ দমিত হয়। পঞ্চাশ হাজার কৃষক প্রাণ দিয়ে এ বিদ্রোহের মূল্য দিয়েছিলো। ২৮ বছরের যুবক টমাস মুনজারকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে পরে তাঁর মাথা কেটে নেওয়া হয়। এ যুদ্ধের ইতিহাসেও ছত্রে ছত্রে লেখা রয়েছে সামন্ত-সরদারের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী।

১৫১৮ সালে সুইৎসার্ল্যাণ্ডের জুরিক শহরের পাদরী জুইংলি পোপের বিরুদ্ধে, রোমান ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে, প্রচার শুরু করেন। ১৫২৩ সালে পোপ জুরিক-শহরবাসীর কাছে জুইংলিকে পরিত্যাগ করবার জন্যে আবেদন জানান। পোপের এই প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়; পাঁচটি ক্যাণ্টন বাদ দিয়ে বাকি সুইৎসার্ল্যাণ্ড জুইংলির মতই গ্রহণ করে। জুইংলি ধর্ম ও

রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই খাঁটি গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাস করতেন, জনসাধারণের ওপর তাঁর আস্থা ছিলো—লুথারের যে গুণটি ছিলো না।

১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে জুইংলি মারা যান। তাঁর আরব্ধ কাজের ভার গ্রহণ করে তাকে ছড়িয়ে দিলেন ফরাসী চিন্তানায়ক জন ক্যালভিন। নিরাপত্তার জন্যে ফ্রান্স থেকে জেনিভায় পালিয়ে আসেন তিনি। সেখান থেকে জুইংলি ও লুথারের মতের সমন্বয় সাধন করে তিনি যা প্রচার করলেন, দেখতে দেখতে তা ইউ-রোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো। লুথারের মতবাদ যেখানে জার্মান রাজাদের যন্ত্রে পরিণত হলো, ক্যালভিনের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সেখানে হল্যাণ্ডে, ইংল্যাণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে লোকায়ত্ত সরকারের পক্ষে মতবাদ ও দল গড়ে তুলতে লাগলো।

পোপ-শাসনের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বিদ্রোহ এলো অন্য উপ-লক্ষ্য নিয়ে। এখানে বিদ্রোহের নায়ক রাজা অষ্টম হেনরি। রোমান ক্যাথলিক মতে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। রাজা হেনরি চান বিয়ে বাতিল করতে। মামলা সাজিয়ে তিনি পোপের কাছে নিবেদন করলেন যে তাঁর বিয়েটা গোড়াতেই অসিদ্ধ হয়েছিলো পোপ এটুকু বলে দিন। পোপ হয়তো তা বলে দিতেনও; কিন্তু সে কথা বলতে গেলে "পূত রোমান সাম্রাজ্যের" সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে চটাতে হয়,—যেহেতু ইনি আবার হেনরির স্ত্রীর আত্মীয়া।

পোপ ভাবলেন, কিছুদিন অন্তত ব্যাপারটা চেপে যাওয়া যাক। কিন্তু ওদিকে হেনরির তাড়া; পোপের চুপচাপ থাকাটা তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। একটার পর একটা আঘাত

আসতে লাগলো রোমের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে; ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা হলো, রাজাকেই ইংল্যাণ্ডের চার্চের কর্তা বলে ঘোষণা করা হলো।

দেশে দেশে এই ধর্মবিপ্লবের ফলে ক্যাথলিক চার্চকেও ঘর সামলাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে হয়। ক্যাথলিক ধর্মের মতামতকে অনেক দিক থেকে আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়। ক্যাথলিক পাদরীদের মধ্যে যেসুইট বা "যীশুর সমাজ" প্রভৃতি নামে সমিতি স্থাপিত হয়, যারা ক্যাথলিকবাদের প্রচার ও প্রাধান্যস্থাপনের জন্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাথলিক রাজত্বগুলির মধ্যে, বিশেষ করে স্পেনে, 'ইনকুইজিশন' নামে বিশেষ ধর্মীয় বিচারশালা স্থাপিত হয়, যার মারফতে ধর্মদ্বেষীদের খুঁজে বার করে নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

রাজনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সারা ইউরোপজোড়া ধর্মবিপ্লবের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবাদের জয় হলো। যে যার নিজের নিজের জাতীয় ধর্মের অনুসরণ করতে লাগলো এর ফলে। এমনকি, ক্যাথলিক দেশগুলোতেও জাতীয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অনেক বেশি স্বীকার করে নেওয়া হলো। আর এরই সঙ্গে জয় হলো রাজার একনায়কত্বের। "ঈশ্বরের প্রতিনিধি পোপ" এই ধ্বনির বদলে বিভিন্ন রাজদরবার থেকে আওয়াজ উঠতে শুরু হলো: "ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজা!"

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিক দিয়ে অল্পবিস্তর গণতান্ত্রিক মতামত আসর গাড়তে শুরু করলো। এ দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলো ক্যালভিনপন্থীরা।

এ বিপ্লবের মাধ্যমে চার্চের জমি ও সম্পত্তি বড়োলোকেরা বাঁটোয়ারা করে নিলো তো বটেই, চিন্তাধারার দিক থেকেও অনেক পরিবর্তন স্থায়ী হলো। ক্যালভিনের মতবাদ তো ধনিকদের অর্থনৈতিক মনোভাবের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। প্রচারিত হতে থাকলো,—অলসতা পাপ, দারিদ্র্য ঈশ্বরের বিমুখতা ও ঐশ্বর্য ঈশ্বরের কৃপাকটাক্ষের চিহ্ন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ধনিক-বণিক চিন্তাধারা ইউরোপে স্বকীয় প্রাধান্য বিস্তার করেছে,—এতোদিনে তার পক্ষে ধর্মের সমর্থন মিললো। নতুন ধর্ম নতুন সমাজেরই জয়গান গাইলো।

॥ ইউরোপীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি ॥

বাণিজ্যের প্রসার, দৈনন্দিন জীবনে টাকাপয়সার প্রচলন এবং শহরের উৎপত্তি,—এই তিনে মিলে চাষীর পায়ের বেড়ি খোলবার ব্যবস্থা করে দিলো।

কারণ, শহর গড়ে ওঠা মানেটা কী?

না, গাঁ আর শহরের মধ্যে কাজের ভাগ হয়ে যাওয়া। গাঁয়ের লোক খাবার-দাবার তৈরি করবে, শহরের লোক বানাবে অন্য জিনিসপত্র : তারপর টাকা-পয়সার হাত-চলাচলের মধ্যে দিয়ে দুদলের তৈরি জিনিস অদল-বদল হবে।

এক কথায়, গাঁয়ে তৈরি খাদ্য-দ্রব্যের একটা বাজার হলো।

আগে বাড়তি ফসল ফলাবার কোনো তাগিদ ছিলো না সাধারণ ভূমিদাসের। আজ দেখা গেলো বাড়তি ফসল শহরের লোকের কাছে বিক্রি করতে পারলে টাকা মিলবে,—যার বদলে

অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে।

ফলে, সারা ইউরোপ জুড়ে অনাবাদী বহু জমিতে হাল নামলো। কোথাও জমিদারের কাছ থেকে টাকার খাজনায় বন্দোবস্তি নেওয়া হলো ; কোথাও জমিদার সেধে চাষী এনে বসালো। জমিদারেরও স্বার্থ ছিলো,—তারও তো কাঁচা টাকা দরকার। আর ব্যবস্থাটা এমনই হলো যে এইসব জায়গাতে টাকায় খাজনা দিলেই, ল্যাঠা মোটামুটি চুকলো ; সামন্তবাদী অন্যান্য প্রভুত্বের দড়ি আলগা হয়ে গেলো অনেকখানি।

এই সব নতুন নতুন "স্বাধীন" চাষী-উপনিবেশের প্রতিক্রিয়া এসে পড়লো জমিদারের আদি জমিতে। পুরোনো ভূমিদাসরাও টাকায় বন্দোবস্তি নেবার জন্যে পেড়াপেড়ি শুরু করতে লাগলো। জমিদারও বহু জায়গায় মানতে রাজি হয়ে গেলো। নিজের জমিতে চাষের জন্যে বরং টাকা দিয়ে জন খাটানো স্থবিধের। কারণ, জমিদার-বাবুরাও এটা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে স্বাধীন মানুষ খাটে ভালো, খাটে বেশি। তার ওপর আবার ভূমিদাসের লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ভয় ছিলো।

এর পরে এলো সারা ইউরোপজোড়া ব্যাপক, ভয়াবহ মহামারী,—প্লেগ। একবার নয়, বারবার, ঘুরে ঘুরে এলো এই মহামারী—ইউরোপের বিশাল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নিয়ে গেলো।

লোক-সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে, অর্থনীতির অমোঘ নিয়মেই জন-মজুরের মজুরি বাড়লো। সামন্ত প্রভুরা অনেক জায়গাতেই পুরোনো বেগারপ্রথা চালাবার চেষ্টা করলো।

ফলে এলো কৃষক-বিদ্রোহ।

নিষ্ঠুর দমননীতির রথচক্রের তলায় কৃষক বিদ্রোহকে দলে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু জীবনের ধর্ম থেকে যে দাবি উঠেছে তাকে অতো সহজে অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি। টাকায় খাজনা দেবার অধিকার মানতে হয়েছে। পুরোনো সামন্ত ব্যবস্থার হাড়ে ঘুণ লেগে গেছে।

তবু দুটো কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, এ পরিবর্তন সারা ইউরোপে একই সময়ে, একই পর্যায়ে আসে নি। যে সব জায়গায় টাকাপয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্যের চল বেশি হয়েছে, শহর বেশি গড়েছে,—সেখানে পরিবর্তন এসেছে আগে। অন্যান্য বহু জায়গা তখনও আগের অবস্থাতেই পড়েছিলো।

দ্বিতীয়ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে চাষীর কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা মানা হলেও, সামন্তবাদী শাসন-শোষণ সম্পূর্ণ মরে গেছে ভাবলে ভুল হবে। একটার পর একটা বিপ্লবের কাহিনী আমরা পড়বো; দেখবো, একের পর এক অনেক রাজার শিরশ্ছেদের ভেতর দিয়ে সামন্তবাদের অপসারণের কাজ এগিয়ে গেছে।

চাষবাসের ব্যাপারে কিন্তু আরও একটা বড়ো পরিবর্তন আসতে শুরু হয়ে গেছে।

আগে বলা হয়েছে আর ৩৪ পৃষ্ঠায় ছবিতেও দেখেছো যে সেই সময়ে চাষ চলতো খোলা মাঠে টুকরো টুকরো জমিতে। এখন একটা ব্যবস্থা চালু হতে আরম্ভ করলো,—এক চাপে সমস্ত জমিগুলো এক করে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা; ইংরিজী ভাষায় বলে “এনক্লোজার মুভমেণ্ট”। কোথাও কোথাও চাষীরা নিজেদের

মধ্যেই অদল বদল করে জমি ঠিক করে নিলো চাষের উন্নতির জন্যে কিন্তু বেশির ভাগ জায়গাতেই জমিদার ব্যাপকভাবে বেড়া দিয়ে চাষীদের উচ্ছেদ করতে লাগলো সেই জায়গায় ভেড়া চড়াবার জায়গা করতে, কারণ ভেড়ার লোমের ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। কাজেই কোথাও চাষের জমি, কোথাও ভিটের জমি কোথাও বা সর্বসাধারণের গোচারণভূমি,—একে একে জমিদারদের লোভের খাঁই মেটাতে নিঃশেষ হয়ে গেলো। চাষের জমি হারিয়ে, গোরু-মোষ হারিয়ে, এমন কি মাথা গোঁজবার ভিটেমাটি হারিয়ে,—দলে দলে রিক্ত, নিঃস্ব কৃষক তার পরিশ্রম করবার শক্তিটুকুর ভরসায় শহরে এসে দাঁড়ালো। বললো : কাজ চাই।

শহরে কিন্তু এতোদিনে কাজ করবার লোকের একটা দাবি উঠছিলো।

সেদিন চলে গেছে, মানুষ যখন শুধু ব্যবহারের জন্যেই জিনিসপত্র তৈরি করতো। এখন মাল তৈরি হয়, বিক্রি হয়—টাকা রোজগারের জন্যে। প্রথম অবস্থায় গিল্ড প্রথার আধিপত্য। কিন্তু, বুঝতে হবে যে এখনও মালপত্রের বাজার খুব ছোটো;—তাই গিল্ড প্রথার একচেটিয়া আধিপত্য ও অতো কড়াকড়ি বাঁধনের মধ্যে উৎপাদন সম্ভব হয়।

কিন্তু দেখতে দেখতে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, —এই চারটি মহাদেশ জুড়ে বাণিজ্য চলতে আরম্ভ করেছে। এখন পুরোনো সীমায় উৎপাদনের ব্যবস্থাকে আটকে রাখলে চলে কি ?

প্রথমে শুরু হলো 'দাদন দেওয়া' ; ইংরিজিতে বলে 'পুটিং

আউট' বা 'ডোমেষ্টিক সিষ্টেম'। অর্থাৎ, এখানে ব্যবসাদার কাঁচা মাল কিনে কারিগরদের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতো। তারপর, তারা মাল তৈরি করলে, তাদের কাছ থেকে সেই মাল কিনে এনে বাজারে বিক্রি হবে।

লক্ষ্য করতে হবে,—কারিগর এখানে কাঁচা মালের এবং বিক্রির 'বাজারের' ওপর কর্তৃত্ব হারিয়েছে। এর পরের পর্যায়ে দেখবো, সে তার হাতিয়ারও হারিয়েছে। মালিকের ঘরে, মালিকের যন্ত্রে, মালিকের কাঁচা-মাল নিয়ে, সে পণ্য উৎপাদন করেছে,—আর সেই পরিশ্রমের পণ্য থেকেই মালিকরা মুনাফা লুটছে। সেই হচ্ছে 'ফ্যাক্টরি' প্রথা, 'ধনতন্ত্রে'র পুরোপুরি কায়েমী হয়ে বসা।

এতো সব ঘটনা একদিনে সব জায়গায় সমানভাবে ঘটে নি: কিন্তু ঘটেছে—যে যুগের গল্প আমরা এখানে বলছি, সেই যুগেই; এবং এসেছে অতি নিশ্চিত পদক্ষেপে।

এই যুগে নানা নতুন নতুন অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ মেলে। ধনী-মহাজন-শ্রেষ্ঠী পরিবার থেকে আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সূত্রপাত দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই রকম এক শ্রেষ্ঠী-পরিবার ছিলো ফ্লরেন্সের 'মেডিচি' পরিবার। ষোড়শ শতাব্দীতে তার জায়গা নেয় জার্মান মহাজন-বংশ 'ফুগার'। বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসায়, রাজা-মহারাজার কাছে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া থাকতো। এদের আর্থিক ক্ষমতা এতো বেশি ছিলো যে "পূত রোমান সাম্রাজ্যের" সম্রাটকেও ধারের টাকা আদায়ের জন্য কড়া ভাষায় তাগাদা করতে দ্বিধা করতো না।



মধ্যযুগের ব্যাঙ্কিং : ফুগারের ব্যাঙ্ক

আমেরিকার একটা দেশ এরা স্পেনের রাজার কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলো, যদিও রাখতে পারে নি। ইউরোপের শহরে শহরে তাদের প্রতিনিধি থাকতো; তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিসের যে নিয়মিত চিঠিপত্র যাতায়াত করতো সেগুলো আজকের ঐতিহাসিকের কাছে সে যুগের ইতিহাস বোঝার একটা সূত্র হিসাবে গৃহীত হয়।

নাম দুজনের করলেও, ছোটো বড়ো আরও বহু ব্যাঙ্কারই ছিলো। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে হুণ্ডি প্রথা তখন প্রথম চালু হয়। প্রচুর মূলধন জড়ো করার জন্যে জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির পত্তন হয়। ফাটকা বাজার গড়ে ওঠে। বীমা ব্যবস্থার পত্তন হয়। হিসাব রাখার নতুন পদ্ধতি চালু হয়। বৃহৎ শিল্পের পত্তন হতে থাকে খনি, ধাতু ও জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে।

এই কয়েক শতাব্দী জুড়ে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটে চলছিলো ইউরোপের বুকে, সে সম্বন্ধে আর দুটি কথার উল্লেখ করেই এ আলোচনায় ছেদ টানবো।

প্রথমত, দেখা গেলো যে,—সারা ইউরোপেই সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে। কেন,—তা বলছি।

একটা গ্রামের কথা ধরা যাক। এখানকার লোকের প্রয়োজন সব গ্রাম থেকেই মেটে,—বাইরের সঙ্গে কোনো কারবার নেই। এখানকার তাঁতি যতো কাপড় বোনে তা এখানকার লোক ধানের বদলে কিনে নিয়ে যায়। এখন, তাঁতি যদি সমান-সংখ্যক কাপড় বানায়, আর সেবার যদি ধান অন্যবারের দ্বিগুণ উৎপন্ন হয়, তবে স্বভাবতই তাঁতি একটা কাপড়ের বদলে দ্বিগুণ ধান পাবে।

সেই সময়কার ইউরোপে টাকাপয়সা ছিলো সোনা আর রুপোয়। আমেরিকা থেকে বিজয়ী স্প্যানিশরা হঠাৎ মন মন সোনা-রুপো লুঠে নিয়ে এলো। স্পেন থেকে সারা ইউরোপে সেই সোনা-রুপো ছড়িয়ে পড়লো স্প্যানিশ বড়োলোকদের বিলাসিতার খোরাক মেটাতে। টাকা স্পেনেও রইলো না, সাধারণের হাতেও গেলো না,—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চাঁই-চাঁই ব্যাবসাদার-মহাজনদের সিন্ধুকে গিয়ে এই টাকা সেঁধুলো। মাঝখান থেকে দরাদরি-হাত-চালাচালির ভেতর দিয়ে সব জিনিসের দাম চড়িয়ে দিয়ে গেলো। শুধু স্পেনে নয়, সারা ইউরোপে।

দ্বিতীয় হচ্ছে, মার্কেন্টাইলিজম নামে বিভিন্ন দেশে চালু অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা।

স্পেনের দবদবানি অন্যান্য রাজার মাথা ঘুরিয়েছিলো। স্পেনের রাজদরবারের গৌরব, বিরাট সৈন্যবাহিনী, অভিজাতদের বিলাসিতা,—এর সবকিছুর কারণ হিসাবে সবার চোখ পড়লো স্পেনের কোষাগারে আমেরিকা থেকে লুটে-আনা সোনা-রুপোর

ওপর। কাজেই সোজা হিসেবে বোঝা হলো, যে রাজ্যের স্বর্ণ-সম্পদ্ যতো বেশি তার শক্তিও ততো বেশি। কাজেই খুঁজে দেখো তোমার রাজ্যে সোনা-রুপোর খনি আছে কি না। না হলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মারফত দেশে সোনা-রুপো আমদানি করো। অর্থাৎ, তোমার জিনিস বিক্রি করবে বেশি, অন্য লোকের জিনিস কিনবে কম,—আর বাড়তি পাওনাটা আদায় করে নেবে সোনা আর রুপোয়।

এই তত্ত্বের ফলে প্রায় সমস্ত দেশের সরকারই সোৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার কাজে লেগে গেলো। বাইরে থেকে ভালো ভালো কারিগর আমদানি করা, বিদেশে চালানি মালের ব্যবসাকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও অর্থসাহায্য দেওয়া, এদের সুবিধার জন্যে বিদেশে কাঁচামাল রপ্তানি নিষেধ করে দেওয়া, এমন কি, কোনো মাল কী ধরনের বা কতোখানি উৎপন্ন হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া,—প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের মা-বাপ হয়ে দাঁড়ালো।

এই তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে শুরু হলো উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি। শুধু সোনা-রুপোর খনির আশাই নয়, উপনিবেশের কাঁচামাল, তার বাজার নিজের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারলে, সোনা-রুপো বেশি পাবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, আমেরিকায় টুপি তৈরি করা চলবে না, কিনতে হবে ইংল্যাণ্ড থেকে; অথবা, আয়ারল্যাণ্ডের পশম ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি হবে, পরে সেই পশমের জামা ফের আয়ারল্যাণ্ডে বিক্রি হবে; অথবা, আমেরিকার পশম যদি হল্যাণ্ডে যায় তবে তা প্রথমে বিক্রি হবে ইংরেজ-ব্যবসায়ীর

কাছে,—সে তখন বিলিতি জাহাজে মাল চাপিয়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে বিক্রি করবে। এক কথায়, উপনিবেশগুলি থাকবে আদি দেশের কামধেনু,—দরাজ হাতে দোহন চলবে।

'মার্কেন্টাইল' কর্মপন্থায় ব্যবসাবাণিজ্য, উৎপাদন কিছু দূর এগিয়েছিলো বটেই। কিন্তু এর মূলমন্ত্রই ছিলো নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তন, এর অবধারিত ফল ছিলো যুদ্ধ। কাজেই অল্প প্রসারের পর এ নীতি অর্থনৈতিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে-সব দেশ এগিয়ে গিয়েছিলো, (ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স) তারা যেমন এ নীতিকে সবার আগে চালু করেছে, —একে বর্জনও তারাই করেছে সবার আগে।

নতুন পর্যায়ের যারা মালিক তাদের রণধ্বনি হলো— "স্বাধীনতা" ; তাদের দাবি হলো সব রকমের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, অবাধ বাণিজ্য (অবশ্যই এ "স্বাধীনতা" নিজেদের সম্পর্কে)। আর অবাধ প্রসারের সুবিধা পাবার জন্যেই এবার তারা হাত বাড়ালো রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের জন্যে।

পাখির ছানা জন্মায়, বড়ো হয়, ডিমের খোলাটার মধ্যে। কিন্তু বড়ো হতে হতে এমন একটা সময় আসে যখন ডিমের শক্ত খোলাটা তার আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে আর কাজ করে না। বরঞ্চ বড়ো হবার পথেই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন শুরু হয় লড়াই, বাঁচবার তাগিদেই পাখির ছানাটা খোলা ভেঙে বেরিয়ে আসে।

একটা সময় পর্যন্ত ইউরোপে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে একচ্ছত্র রাজার কর্তৃত্বকে আশ্রয় করে, তারই সহায়তায়।

কিন্তু তার পরে দেখা গেলো নতুন ব্যবস্থার আরও প্রসারের পথে সাহায্য করতে অক্ষম রাজার একাধিপত্য, ধনিক ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্যেই প্রয়োজন শাসন-ক্ষমতা রাজার হাত থেকে সরিয়ে ধনিকদের হাতে নিয়ে আসা।

তাই, আবার লাগলো লড়াই; এলো বিপ্লব। কোনো রাজার মাথা পড়লো কাটা, কোনো রাজা পালিয়ে গেলো ভয়ে। ধনিকদের নেতৃত্বে এই ধরনের বিপ্লবের প্রথম নিদর্শন ব্রিটিশ বিপ্লব; তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ফরাসী বিপ্লবে।

॥ ব্রিটিশ বিপ্লব ঃ ১৬৪২—১৬৮৮ ॥

রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে ইংল্যাণ্ডের ধনিক-বণিক-নয়া-জমিদারের অস্ত্র হলো পার্লামেণ্ট বা আইনসভা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত দেখা যায় যে রাজারা কোনো না কোনো আলোচনা-সভা ডাকছেন যেখানে সামন্তপ্রভুরা ছাড়াও বিভিন্ন শহরের বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদেরও ঠাঁই হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে প্রথম এডোয়ার্ডের সময় থেকেই মোটামুটি এই ধরনের একটা নিয়ম চালু ছিলো যে নতুন কর বসানো হবে এই পার্লামেণ্টের পরামর্শ নিয়ে। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম হেনরির রাজা হওয়ার সময় থেকে বুর্জোয়ারা (কথাটার আদি মানে হলো শহরবাসী, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানে দাঁড়িয়েছে ধনিক-বণিক শ্রেণী) রাজাদের ইচ্ছামতো কর দিতে রাজি হয়েছে। কারণ, তখন রাজারা দেশময় ছড়ানো সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা চূর্ণ করে একটি শাসন-ব্যবস্থা চালু করছে,

রোমান ক্যাথলিক চার্চের কর্তৃত্বের অবসান ঘটাচ্ছে, বিদেশের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার মতো সামরিক শক্তি গড়ে তুলছে, দেশের মধ্যে ধনিক-বণিকদের প্রসারের সুযোগ করে দিচ্ছে ঃ উপনিবেশের লুণ্ঠন, দাস-ব্যবসায়, বৈদেশিক বাণিজ্য, দেশের ভেতর "ঘেরাও প্রথার" ভেতর দিয়ে চাষীর উচ্ছেদ,—এই প্রত্যেকটির ভেতর দিয়ে ইংরেজ ধনিক-বণিকরা বিশাল বিত্ত সঞ্চয় করেছে। আর এই অর্থসম্পদকে তারা অনেক ক্ষেত্রেই লাগিয়েছে নতুন জমিদারি কিনতে। এই নতুন জমিদারদের ধনিক-জমিদার বলে অভিহিত করা যেতে পারে ; কারণ এরা মুনাফা করবার উপায় হিসাবেই জমিদারি চালাতো। ১৫৮৮ সালে, প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বে ইংরেজ নৌশক্তির কাছে স্পেনের বিশাল নৌবাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো, তখন থেকে ইংরেজ বুর্জোয়ার মনোভাব পাল্টালো। তার চোখের সামনে সমস্ত বিপদ অন্তর্হিত হলো ; নিজের শক্তির ওপরে সে অনেক বেশি আস্থাবান হয়ে উঠলো। কাজেই প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বে শেষের দিক থেকেই পার্লামেণ্টের সঙ্গে রানীর ঝগড়া দানা পাকাতে থাকে।

প্রথম এলিজাবেথের পর ১৬০৩ সালে প্রথম জেমস ইংল্যাণ্ডের রাজা হলো। প্রথম জেমস সেয়ানা হয়তো কম ছিলো, কিন্তু সমস্যাটা যে আসলে কোনো রাজার ব্যক্তিগত শুভবুদ্ধির ওপরে নির্ভর করছিলো,—তা নয়। বুঝতে হবে, ঝগড়াটা চলেছে রাজকোষের কর্তৃত্ব নিয়ে। সে কর্তৃত্ব রাজার হাতে থাকবে, না পার্লামেণ্টের হাতে থাকবে,—এই হলো দ্বন্দ্বের-মূল

বিষয়বস্তু। রাজার আয় মূলত তার সামন্ত-সম্পত্তি থেকে। সব জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়াতে খরচ বেড়ে গেছে আগের চেয়ে বহুগুণ। এ ক্ষেত্রে নতুন ধনীদের ওপর কর বসিয়ে আয় না বাড়ালে রাজার রাজত্ব করা চলে না। এর পাল্টাপাল্টি বুর্জোয়ারা দাবি করতে আরম্ভ করলো, পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া কোনো কর বসানো চলবে না এবং রাজকোষের সমস্ত আয়ব্যয় পার্লামেন্টই নির্ধারিত করবে। এ দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করা মানে, সামন্তবাদী একচ্ছত্রাধিপতি রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা। কাজেই সংগ্রাম অনিবার্য। সংগ্রাম ঘনাতে লাগলো।

ক্ষমতার লড়াইয়ের সূত্রপাত প্রথম এলিজাবেথের সময়ে; এর প্রসার প্রথম জেমসের সময়ে; এর চূড়ান্ত বিকাশ প্রথম চার্লসের রাজ্যচ্যুতি ও শিরশ্ছেদের মধ্যে দিয়ে। ১৬২৫ সালে প্রথম চার্লস রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্লামেন্টের সঙ্গে তার ঝগড়া শুরু হয়। ১৬২৮ সালের পার্লামেন্ট ঘোষণা করে যে পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া কর বসানো চলবে না এবং আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার করা চলবে না। রাজার পক্ষে নিজের কর্তৃত্বাধীনে সৈন্য-বাহিনী রাখাও প্রায় অসম্ভব করে তোলবার প্রস্তাব হলো। চার্লস কারে পড়ে সাময়িকভাবে এসব প্রস্তাব মেনে নিলেও, সঙ্গে সঙ্গেই এর ব্যাখ্যা নিয়ে ঝগড়া শুরু করলো এবং জোর করে পার্লামেন্ট বন্ধ করে দিলো। এর পর ১১ বছর ধরে আর সে পার্লামেন্ট ডাকলো না; রাজার অধিকারের নাম করে কর আদায় করে রাজত্ব চালাতে লাগলো।

বিরোধ এদিকে চলতেই থাকলো। ১৬৩৯-৪০ সাল নাগাদ দেখা গেলো যে সাধারণভাবে অনেকেই রাজার বসানো কর দিতে অস্বীকার করছে। বুর্জোয়ারা হরতাল ঘোষণা করেছে।

১৬৪০ সাল নাগাদ চার্লস একেবারেই দেউলে হয়ে পড়েছে। আর খামখেয়ালী কাজের ভেতর দিয়ে চটিয়েছেও সব রকমের লোককে। পার্লামেন্ট না ডাকলেই নয়। তবু সে একটা পার্লামেন্ট ডেকেই তাকে ভেঙে দিয়েছিলো। কিন্তু তাতে চললো না; ১৬৪০-এর নভেম্বর মাসে ফের পার্লামেন্ট বসলো,—লং পার্লামেন্ট নামে অভিহিত এই দীর্ঘ অধিবেশন।

সে অধিবেশনে চার্লসের অযোগ্যতা প্রমাণ করে বিরাট অভিযোগপত্র পেশ করা হলো। কিন্তু দেখা গেলো আগের পর্যায়ে অতোদূর অগ্রসর হয়ে এবারে বড়ো ধনীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রস্তাব মোটে এগারো ভোটে পাশ হয়। ৪ঠা জানুয়ারি চার্লস কয়েক শো সশস্ত্র পরিচর নিয়ে পার্লামেন্টের পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করতে উপস্থিত হলো। এরা খবর পেয়ে আগেই লণ্ডনের ভেতরে লুকিয়ে ছিলো। নেতাদের আহ্বানে লণ্ডনের মানুষ অস্ত্র হাতে এগিয়ে এলো পার্লামেন্টকে রক্ষা করতে। চার্লস ১০ই জানুয়ারি ইয়র্কে পালিয়ে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলো। গৃহযুদ্ধ শুরু হলো।

গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্যায় শেষ হলো ১৬৪৬ সালে প্রথম চার্লসের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। এর ভেতরে পার্লামেন্টারি শক্তির মধ্যে বিভিন্ন ধারার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে দেখা গেলো। বড়ো বড়ো জমিদাররা গোড়া থেকেই ছিলো আপোসপন্থী। 'নিরেনব্বুই বার

হারালেও রাজা রাজাই থাকবে'—এই ছিলো এদের মনোভাব। প্রধান শক্তি ছিলো ক্রমওয়েলের পরিচালনায় 'নিউ মডেল আর্মি'। আপোসরফার বিরোধী ছোটো ছোটো জমিদার ও অন্যান্য শ্রেণী ছিলো এদের নেতৃত্বে। আর তৃতীয় শক্তি দেখা দিলো এই 'নিউ মডেল আর্মির' ভেতরেই 'লেভেলার' নাম নিয়ে গরিব কারিগর প্রভৃতির দল। ক্রমওয়েল তাঁর 'নিউ মডেল আর্মিতে' দক্ষ সৈনিকদের অফিসার হিসেবে নিয়োগ করতেন; সেনাবাহিনীতে খোলাখুলি সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতো। এই 'নিউ মডেল আর্মি'তেই 'লেভেলার' মতবাদ ছড়িয়ে পড়লো। এরা রাজাকে চাইতো না; এদের মতে পার্লামেণ্টই সব ক্ষমতার মালিক হবে। প্রতি দু বছর অন্তর নতুন করে নির্বাচন হবে এবং মাইনে-নেওয়া মজুর ছাড়া ২১ বছরের ওপরে সমস্ত পুরুষই ভোট দিতে পারবে। (তাদের ধারণা ছিলো মজুরদের ভোটের অধিকার দিলে তারা মালিকদের কথামতো ভোট দেবে)। এ তিন শক্তির নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলেন অলিভার ক্রমওয়েল। নিজে একজন বড়ো জমিদার হলেও মধ্যবিত্ত ও গরিবদের আস্থা ছিলো তাঁর ওপর; বড়োর দলকে হঠিয়েই তাঁর হাতে ক্ষমতা এলো।

চার্লস যুদ্ধে হারলেও আশা হারায় নি; রাজার ভরসা ছিলো: নিজেদের ঝগড়াতেই শত্রুপক্ষ দুর্বল হবে; ক্ষমতা ফের তার হাতে ফিরে আসবে। অবস্থা সেই দিকেই এগুচ্ছিলো। চার্লস কোন আপোসরফা না মেনে বন্দীদশা থেকে পালিয়ে গেলো। নিউ মডেল আর্মি এবার পার্লামেন্ট থেকে আপোস-

কামীদের জোর করে বের করে দিলো। বাকি অল্পসংখ্যক 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' হাউস অফ্ লর্ডস উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব নিলো; রাজার বিচারের জন্যে এক কমিশন বসালো।

বিচারে রাজার প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো: রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড হলো ১৬৪৯ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। রাজার বিচার ও প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ইতিহাসে এই প্রথম স্থান পেলো।

সাধারণতন্ত্রী সরকার ঘোষিত হলো বটে, কিন্তু ভোটের অধিকার বাড়ানো এবং লেভেলাররা অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে সমস্ত দাবি জানিয়েছিলো, সেগুলো কিছুই মিটলো না। ফলে, লেভেলারদের বিক্ষোভ নিউ মডেল আর্মিতে বিদ্রোহের রূপ নিলো। ক্রমওয়েল কড়া হাতে সে বিদ্রোহ দমন করেন।

এর পরে ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের একনায়কত্ব চলে। ১৬৬০ সালে প্রথম চার্লসের ছেলে দ্বিতীয় চার্লসকে আবার সিংহাসনে ফিরিয়ে আনা হয়। কেননা, ইংলণ্ডের বণিক-ধনিকেরা বুঝতে শুরু করলো, সাধারণতন্ত্রী শক্তির অতোখানি বাড়াবাড়ি আর তাদের পক্ষেও নিরাপদ নয়। ফলে রাজাকে শুধু ফিরিয়ে আনাই নয়—তাঁকে চার্চ অব ইংলণ্ডের প্রধান করা হলো, যাতে ধর্মবলে সাধারণ মানুষকে শাসনে রাখা সহজ হয়। তাছাড়া রাজাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হলো যাতে বণিক-ধনিক-বিরোধী পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত রাজা নাকোচ করে দিতে পারে। তাছাড়া, যে জমিদারদের সঙ্গে

বণিক-ধনিকদের এতোদিন গৃহযুদ্ধ চলেছিলো তাদের সঙ্গেই আবার এরা জনসাধারণের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়ে ফেললো।

॥ আমেরিকার বিপ্লবী অভ্যুত্থান (১৭৭৫) ॥

উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের ১৩টা কলোনি ইংল্যাণ্ডের জমিদার-ধনিকদের চোখে ছিলো কামধেনুর মতো ; সবরকমে ইংল্যাণ্ডের সেবা করাই তাদের জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করা হতো।

ফলে ইংরেজ শাসকরা আইন করলো,—ইংরেজ জাহাজ ছাড়া অন্য কোনো জাহাজে ব্যবসার মাল চলাচল করতে পারবে না ; ইংরেজ ব্যবসায়ী ছাড়া বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা করা চলবে না ; বিভিন্ন ধরনের মাল তৈরি করা চলবে না, যেহেতু সেগুলো ইংল্যাণ্ডে তৈরি হয় ; কলোনিতে টাকা ছাপা চলবে না ; এমনকি, তামাক, তুলো প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত পণ্যের মূল্যও বিলেত থেকে নির্দিষ্ট হতো।

কাজেই সমস্ত রকমের মানুষ যে বিক্ষুব্ধ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

ইংরেজদের শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকার উপনিবেশে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির শিল্প-ব্যবসা প্রভৃতি জন্ম নিয়েছে—প্রায় ৭৫ বছর ধরে উপনিবেশের দখলদারি নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে যে লড়াই চলেছে ইংল্যাণ্ডের, তারই সুযোগ নিয়ে এরা শক্তি সঞ্চয় করেছে। যুদ্ধে ব্যস্ত ইংল্যাণ্ড কলোনির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঠেকাতে পারে নি।

কিন্তু উপনিবেশের এ ঔদ্ধত্য স্বভাবতই রাজশক্তি সহ্য করতে পারে না। একটার পর একটা দমনমূলক আইন পাশ হলো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে ; কলোনিকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে ভাড়াটে সৈন্য পাঠানো হলো আমেরিকার উপকূলে।

এর বিরুদ্ধে আমেরিকায় বিক্ষোভ জমাট বাঁধতে লাগলো।

১৭৬৫ সালে "স্বাধীনতার সন্তানদল" নামে সংগঠন গড়ে উঠলো। ঐ সালেই ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে আইন রদ করতে হয়।

১৭৬৭ সালে আবার কয়েকটা জুলুমদার আইন পাশ হয় ; কাঁচ, কাগজ, চা প্রভৃতির ওপর কর বসানো হয়। কিন্তু সাধারণের বিরোধিতায় কর আদায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সৈন্য বোষ্টনের বিক্ষোভকারী জনতার ওপর ১৭৭০ সালে গুলি চালায়। ৬ জন আমেরিকান (একজন নিগ্রোসমেত) এতে মারা যায়। দেখতে দেখতে বিক্ষোভ বাড়তে লাগলো ; "স্বাধীনতার সন্তানদল" ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো।

১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কুখ্যাত "টী অ্যাক্ট" বা চা আইন পাশ করলো। এর প্রতিবাদে আমেরিকায় ধ্বনি ওঠে : "বিনা প্রতিনিধিত্বে কর বসানো চলবে না।" ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে বোষ্টন বন্দরে একদল লোক ছদ্মবেশে ১৭ হাজার পাউণ্ডের চা জলে ফেলে দেয়। ফলে, ব্রিটিশ অত্যাচার বহুগুণ বেড়ে যায়।

বিপ্লবী আন্দোলন ধাপে ধাপে এগোতে থাকে। ১৭৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রথম কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের অধিবেশন

বসে। দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৭৭৫ সালের মে মাসে। স্বাধীনতার দাবির ওপর লেখা টমাস পেইনের বিখ্যাত বই “কমন সেন্স” বেরোয় ১৭৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে। স্বাধীনতার দাবি ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী বাগিচামালিক জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার দেওয়া হয়।

১৭৭৬ থেকে ১৭৮৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরের তিক্ত সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ইংরেজ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। ১৭৮৩ সালের প্যারিস চুক্তির মারফত ইংল্যাণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়।

॥ ফরাসী বিপ্লব : (১৭৮৯-৯৩) ॥

ফরাসী বিপ্লব এলো সারা ইউরোপকে চমকে দিয়ে, অবাক করে দিয়ে।

আসলে বাইরে থেকে টের না পাওয়া গেলেও ভেতরে ভেতরে এ অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো

সারা ফ্রান্সের ২ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ লোকই ছিলো চাষী। এদের মধ্যে খাঁটি ভূমিদাসের সংখ্যা হয়তো লাখ দশেকের বেশি হবে না। কিন্তু ধনী কৃষকের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। যাদের জমি ছিলো তাদের অবস্থা এমন যে নিজের জমিতে চাষ করে সারা বছর পরিবারের খরচ চলে না। ভূমিদাস, চাকর, দিনমজুর, ভাগচাষী প্রভৃতিই গড়ে

তুলেছিলো বিরাট কৃষকসমাজ।

আর, যার যেরকমই অবস্থা হোক না কেন, সকলের ওপরেই ছিলো জমিদারের নানা রকম শোষণ, চার্চের সেলামি, রাজার খাজনা।

কাজেই সমস্ত কৃষকসমাজ উদগ্রীব হয়ে ছিলো একটা বড়ো রকমের পরিবর্তনের জন্যে। তারা চেয়েছিলো জমিদারি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধুয়ে মুছে ফেলতে, আর চেয়েছিলো প্রত্যেকের জন্যে এমন খানিকটা জমি যা চাষ করে ফসল ফলিয়ে বৌ-ছেলে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারা যায়।

এদিকে নতুন-ওঠা ধনিকরা চাইছিলো তাদের কারখানায় এসে সস্তায় পরিশ্রম করার মতো যথেষ্টসংখ্যক লোক,—এবং জমিদারিপ্রথার নাগপাশ থেকে জমিহারা চাষীর দলকে ছাড়িয়ে আনতে পারলে সে ইচ্ছে পূরণ হতে পারে।

ধনিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো অন্যান্য কারণেও। রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, ধনিকপ্রথার অগ্রগতির বাধাস্বরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যের সব ব্যাপারে রাজার অহেতুক হস্তক্ষেপ, রাজ-কোষের অপব্যয়, রাজদরবারের বিলাসিতা, সামন্তপ্রভুদের রাজা-রানীকে খুশি করে পরগাছার মতো রাজকোষ শুষে নেবার অপকৌশল,—এই সমস্ত কিছুই তারা ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিতে চাইছিলো। এক কথায়, তারা চাইছিলো নতুন শাসন-ব্যবস্থা, যা চলবে তাদের কর্তৃত্বে।

চিন্তার জগতেও এসেছিলো এক বিরাট পরিবর্তন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সময়টা "যুক্তিবাদের

যুগ", "আলোকপ্রাপ্তির যুগ" বলে ইতিহাসে পরিচিত। এই দীর্ঘ সময় ধরে সারা ইউরোপে বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, যে অপর্যাপ্ত ফসল ফলেছিলো তার সামান্য উল্লেখমাত্র আগে করা হয়েছে। বিশদ আলোচনা সম্ভব না হলেও, একথা বলা যায় যে সামন্ত প্রথা মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে যেসব শিকড় গেড়ে বসেছিলো এবারে সেগুলোর মূল ধরে উপড়োবার চেষ্টা চললো। আগের যুগের বৈশিষ্ট্য ছিলো : "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ"। আর এ যুগের মানুষ সবকিছুই তর্ক ক'রে, যুক্তি দিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়ে বুঝতে চায়। এ মনোভাবকে সম্ভব করেছিলো বিজ্ঞানের অগ্রগতি। সামন্তবাদী যুগে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েই তাকে গ্রহণ করা হতো। আর এ যুগে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মূল ধারাগুলিও বৈজ্ঞানিক বিচারে যাচিয়ে নিয়ে তবেই তার মূল্য নির্ধারণ হতে থাকলো।

"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—একথা এ যুগের দর্শনের মূল বক্তব্য নয়। ঈশ্বর নেই,—এতোদূর পর্যন্ত সবাই না গেলেও, দার্শনিকরা প্রধানত গতিশীল, চলমান, বাস্তব জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই জানবার একমাত্র পন্থা,—এ কথাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য",—অর্থাৎ, সমস্ত কাজেরই লক্ষ্য হবে মানুষের সুখ, মানুষের শান্তি।

এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে কার নাম করবো? বেকন, দেকার্ত, হেলভেশিয়াস, হলবাক, ভোলটেয়ার, দিদারো, লক,

মণ্টেস্কো, রুসো.........আরও কতো কতো মনীষী। এঁদের প্রত্যেকের লেখনীই মানুষের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক আলোকিত করেছে। বেকন, দেকার্ত, হেলভেশিয়াস, হলবাক্ নতুন দর্শনের ভিত্তি গেড়েছেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শ্লেষবাণে ভোলটেয়ার ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির সবরকমের অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও ভণ্ডামি খণ্ড খণ্ড করেছেন। দিদারো এক বিশ্বকোষ সম্পাদনা করেছেন যা ফরাসী তথা ইউরোপীয় চিন্তাধারার উপর এক দীর্ঘায়ত প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজনীতির বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ বলেছেন, রাজা ও প্রজার সম্পর্ক হচ্ছে চুক্তির রাজা যদি প্রজার প্রতি তার কর্তব্য না করে তবে সে রাজাকে হঠিয়ে দেবার অধিকার প্রজার আছে। মণ্টেস্কো রাজার একাধিপত্যের বদলে প্রজার অধিকার কিভাবে বজায় রাখা যায়, তার পথ অনুসন্ধান করেছেন। রুসো বললেন,—রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হলো জনসাধারণ, রাজার তাতে কোনোরকম অধিকারই নেই।

কাজেই চিন্তার ক্ষেত্রেও সামন্তবাদ ও অবাধ রাজশক্তির মূলে নাড়া পড়েছিলো।

কিন্তু বিপ্লব ঘটতে গেলে ব্যাপক জনসাধারণের পুরোনো কায়দায় চলতে অনিচ্ছুক হওয়াই যথেষ্ট নয়, পুরোনো ব্যবস্থার পুরোনো ধরনে চালু থাকাটাই অসম্ভব হয়ে ওঠা প্রয়োজন।

সেই অবস্থাই ঘটেছিলো ফ্রান্সে।

শূন্য কোষাগার হাতে নিয়ে দেউলে রাজা যোড়শ লুই ১৭৮৮ সালের ৮ই আগষ্ট ঘোষণা করলেন যে এবারে "এষ্টেট্স্ জেনারেলের" অধিবেশন বসানো হবে। ১৬১৪ সালের পর ফরাসী

আইন-সভার এই প্রথম অধিবেশন বসলো ভার্সাইতে ১৭৮৯ সালের ৫ই মে তারিখে।

ফরাসী আইনসভা বা "এষ্টেট্‌স্ জেনারেল" ছিলো তিনটে খোপে ভাগ করা,—এক খোপে হলো ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক চার্চের কর্তাব্যক্তিরা. অর্থাৎ, ধর্মযাজকের দল; দ্বিতীয় খোপে হলো সামন্তসরদারের দল আর "থার্ড এষ্টেট্" বা 'তিসরা বর্গে' স্থান পেলো দেশের বাকি মানুষের প্রতিনিধিরা। এখন রাজকীয় ঘোষণায় ছিলো যে তিসরা বর্গের প্রতিনিধিরা যেন রাজমন্ত্রীদের অবগতির জন্যে দেশের লোকের অভিযোগের তালিকা তৈরি করে নিয়ে আসে। সাধারণ লোকের মন ভোলাবার জন্যে এ চাল দেওয়া হলেও রাজার পক্ষে ফল হলো উল্টো। দেশের কোণে কোণে অভিযোগপত্র প্রস্তুত হতে লাগলো; সমস্ত লোক রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার আবর্তে এসে পড়লো; দেশময় এক রাজনৈতিক জাগৃতি দেখা গেলো; বিভিন্ন প্রতিনিধি যে সমস্ত অভিযোগপত্র নিয়ে হাজির হলো তার মারফতেই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পার্টি গড়ে ওঠবার ভিত্তি তৈরি হলো।

রাজা বললো: তিন বর্গ আলাদা আলাদা ভোট দেবে। অর্থাৎ, তাতে করে প্রথম দুইয়ে জোট বেঁধে তিসরা বর্গের সমস্ত প্রস্তাবই বানচাল করে দিতে পারবে।

তিসরা বর্গ বললে: তা হবে না; সমস্তকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটি আইনসভা হিসেবে স্বীকার করতে হবে।

রাজার মন্ত্রী এসে তাদের সভাকক্ষে ঢুকবার পথ আটকে দাঁড়ালো। এরা এক টেনিস কোর্টে জড়ো হয়ে শপথ নিলো।

যে ফরাসীজাতির জন্যে একটা গঠনতন্ত্র তৈরি না করে তারা কিছুতেই এ আইনসভা ভাঙবে না। রাজপারিষদ চোখ রাঙাতে এসে শুনে গেলো মিরাবোর অমর বাণী : "যাও, তোমার প্রভুকে বলো গে যাও, জনসাধারণের আদেশে আমরা এখানে হাজির হয়েছি, একমাত্র বেয়নেটের খোঁচাতেই আমাদের তাড়াতে পারবে।"

রাজাকে হার মানতে হলো। ১৭৮৯ সালের ৯ই জুলাই আইনসভা নিজেকে "কন্‌ষ্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্‌ব্লি" বা গঠনতন্ত্র-প্রণয়নী সভা বলে ঘোষণা করলো।

১৪ই জুলাই ঘটলো ইতিহাসখ্যাত বাস্তিলের পতন।

কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ছিলো রাজার অপ্রীতিভাজন লোকদের বিনাবিচারে বন্দী করে রাখবার কারাগার। ১৪ই জুলাই প্যারিসের সাধারণ মানুষ বাস্তিল আক্রমণ করে তার পতন ঘটালো। এটা ঠিকই যে এ সময়ে বন্দী খুব সামান্যই ছিলো। এও ঠিক যে দুর্গরক্ষীর সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। তবু শুধুমাত্র ঘৃণিত রাজশাসনের প্রতীক হিসেবেই নয়, বাস্তিলের ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিলো অত্যন্ত বেশি। সুরক্ষিত, সুসজ্জিত বাস্তিল দুর্গ যে শুধু বাইরের আক্রমণ থেকেই প্যারিসকে বাঁচাতে পারতো তাই নয়, সারা প্যারিসকেও তাঁবে রাখতো। "গঠন-পরিষদ" গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দলের ষড়যন্ত্রও চলেছিলো। কিছুটা জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে রাজা ১১ই জুলাই পদচ্যুত করে; ভাড়াটে বিদেশী সৈন্যের দলগুলি রাজা প্যারিসের কাছাকাছি সমাবেশ করতে আরম্ভ করে। কাজেই এই মুহূর্তে

শতাধিক প্যারিসবাসীর জীবনের বিনিময়ে বাস্তিল দখল জনশক্তির বিরাট বিজয়। আজও ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় দিবস।

বাস্তিলের পতনের সংবাদ ফ্রান্সের চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেলো; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে চাষীরা মাথা তুললো। নিজেদের এলাকায় চাষীরা জড়ো হয়ে জমিদারের প্রাসাদ আক্রমণ করতে থাকলো আর সামন্তবাদী প্রভুত্বের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে যতো প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ পুড়িয়ে সাফ করে দিলো।

ঝড়ের সামনে মাথা নোয়ানো ছাড়া সামন্তপ্রভুদের আর গতি ছিলো না। ৬ই আগষ্ট গঠন-পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্তপ্রথা উচ্ছেদ করে দিলো। এবং চাষের কর তুলে দিলো ১১ই আগষ্ট। কিন্তু কাঁকড়াবিছের হুলটি ছিলো লেজের দিকে। প্রস্তাবে বলা হলো,--জমিদারদের বর্তমানের অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে কিনে নিতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষতিপূরণ দিয়ে সামন্ত-প্রথা তোলা হবে। কিন্তু তা দেবার মতো সঙ্গতি কোথায় চাষীর? তার ওপর ১৭৯০ সালের ১৫ই মার্চ ক্ষতিপূরণের ভার আরও বাড়ানো হলো এবং বলে দেওয়া হলো এক চাপে সমস্ত অধিকার কিনে না নিলে, খুচরো খুচরো কেনবার সুযোগ আর দেওয়া হবে না। বোঝা গেলো, বিপ্লবের অগ্নিমূর্তি দেখে ধনীরা ভয় পেয়েছে, তারা সামন্তবাদী অধিকার বজায় রাখার জন্যে গঠন-পরিষদের মধ্যেই তাদের প্রাক্তন শত্রুর সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।

ফলে, গাঁয়ে গাঁয়ে আবার ঘটনা ঘটতে শুরু করলো। চাষীরা ফাঁসিকাঠ খাড়া করলো জমিদারের প্রতিনিধিদের লটকাবে

বলে। আইন কিন্তু তবু এখনো বদলালো না। বদলেছিলো ১৭৯৩ সালের জ্যাকোবিন কনভেনশনের হাতে।

ওদিকে রাজার ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। ভার্সাইতে রাজকীয় সৈন্য আমদানি হয় গঠন-পরিষদকে ভয় দেখাতে।

১৭৮৯ সালের ৫ই অক্টোবর ৮০০০ সশস্ত্র নারী কামান-বন্দুক নিয়ে ভার্সাইতে হাজির হয় এবং রাজাকে সপরিবারে প্যারিসে আসতে বাধ্য করে। গঠন-পরিষদও পরে প্যারিসে আসে। কিন্তু বড়োলোকদের ভয় বেশি করেই লেগেছে : তারা ২৬শে অক্টোবর "উত্তেজিত জনতাকে অস্ত্রবলে" সরাবার আইন পাশ করে। রোব্‌সপিয়ার ও ম্যারাট এ আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন।

১৭৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে গঠনতন্ত্র তৈরি হলো তা সমস্ত মানুষের সমানাধিকারের পবিত্র ঘোষণা দিয়ে শুরু হলেও, সাধারণ মানুষের বহু আশা ভেঙে চুরমার করে দিলো। সামন্তক্ষমতা আংশিক বজায় রাখলো ; রাজার আসন টিকে রইলো ; শুধু ক্ষমতার বড়ো অংশীদার হয়ে আসরে দেখা দিলো বিত্তশালীর দল। "সক্রিয়" ও "নিষ্ক্রিয়" নামে নাগরিকদের ভাগাভাগি করে গরিবদের ভোটদেওয়া ও অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্র থেকেই বার করে রাখলো।

রাজার কিন্তু এ ব্যবস্থা পছন্দ হয়নি। বিদেশের সাহায্যে পুরোনো ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে সে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ১৭৯১ সালের ২০শে জুন তারিখে ধরা পড়ে ও প্যারিসে ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এদিকে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বড়ো বড়ো রাজারা শুধু

যে স্তম্ভিত হয়ে ফ্রান্সের কাজকারবার দেখছিলো তাই নয়, ফ্রান্সে ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরাবার জন্যে তারাও খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলো। ১৭৯১ সালের আগষ্ট মাসে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার রাজা যুক্তভাবে ঘোষণা করে যে ফ্রান্সে শান্তি ও শৃঙখলা ফিরিয়ে আনতে তারা খুবই ব্যস্ত। ১৭৯২-এর এপ্রিল মাসে ফরাসী আইনসভা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধের উস্কানি এসেছিলো রাজা ও প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছ থেকে। রাজা চেয়েছিলো যুদ্ধে ফ্রান্সের হার হয়, তাহলে সে আবার ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে। সামন্তসরদার, বড়ো বড়ো পাদরী-পুরুত খোলাখুলিভাবে শত্রুপক্ষে যোগ দিলো বা গোপনে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি করতে লাগলো। ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের বাজারে লাল হয়ে যাবার আশায় খাড়া হয়ে রইলো। শুধু সাধারণ মানুষের দল জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধে এগিয়ে এলো।

বিশ্বাসঘাতকতা ও আপোসরফার, দিন শেষ হয়েছে। ১০ই আগষ্ট জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে, প্যারিসের সংগঠিত ভলান্টিয়ার-বাহিনীকে পুরোভাগে রেখে, প্যারিসের সাধারণ মানুষ রাজপ্রাসাদ দখল করে রাজা-রানী ও রাজপরিবারকে বন্দী করে। ২১শে সেপ্টেম্বর সর্বসাধারণের ভোটে জাতীয় কনভেনশন নির্বাচিত হয় ; দুদিনের মধ্যে ফ্রান্সে লোকায়ত্ত সরকার ঘোষিত হয়।

এদিকে ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বাস-ঘাতক বলে সন্দেহভাজন সমস্ত লোকের দ্রুত বিচার ও প্রাণদণ্ড চলতে থাকলো। উন্মত্ত জনতার হত্যালীলা বলে এ ঘটনাকে

আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার মূলোৎপাটন না করলে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের লোকায়ত্ত সরকারকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হতো। ফ্রান্স এখন ভাড়াটে সৈন্যের বিরুদ্ধে নাগরিক বাহিনী নিয়ে লড়ছে; ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত অথবা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসঘাতকদের হাতে স্ত্রী-পরিবার ও বিপ্লবের কেন্দ্র প্যারিস শহরের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধে যেতে পারতো না। বরঞ্চ রাহুমুক্তির ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের সফলতা নিশ্চিত হলো। ২রা সেপ্টেম্বর ভাল্মীতে ফরাসী সৈন্যের বিজয় যুদ্ধের ভাগ্যের বিরাট পরিবর্তন আনে; ফরাসী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে পেছু হটতে থাকে রাজতন্ত্রের ভাড়াটে সৈন্যের দল।

কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের জোট ক্রমাগতই আক্রমণ চালিয়ে যায়। ফরাসী সরকার একদিকে ভলান্টিয়ার সৈন্যবাহিনী দিয়ে বাইরের আক্রমণ ঠেকিয়েছে; অপরদিকে দেশের ভেতরকার বিরোধিতা ধ্বংস করবার জন্যে "জননিরাপত্তা কমিটি" খাড়া করেছে "সন্ত্রাস" বলে অভিহিত দ্রুত বিচার ও প্রাণদণ্ডের এক ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনে। কারণ ফ্রান্সে তখন শুধু যুদ্ধই চলছিলো না, ঘটে চলছে এক মূল সামাজিক বিপ্লব। নতুন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার জন্যে কয়েকটি প্রদেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত বিপ্লবী নেতৃত্বের মধ্যেও কর্মধারা নিয়ে সংগ্রাম চলেছে। প্রথমে বড়ো ধনিকদের প্রতিনিধি আপোসপন্থী জিরোণ্ডিষ্টদের হার মানতে হলো এবং তাদের নেতারা গিলোটিনে প্রাণ দিলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে

জ্যাকোবিনদের মধ্যেই বিভেদ শুরু হলো। জাতীয় কনভেনশন যে গঠনতন্ত্র তৈরি করেছিলো তার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিলো। জ্যাকোবিন দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতৃত্ব মধ্যপন্থী রোবস্‌পিয়ের ও চরমপন্থী হিবার্টকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। পরে ড্যানটন প্রভৃতি নেতারা যখন ঘুসখোরদের হয়ে ওকালতি করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁদেরও গিলোটিনে মাথা দিতে হয়।

বিপ্লবী সংস্কারের প্রচেষ্টা থেমে রইলো না। সাধারণের ভেতর থেকে বারবার চীৎকার উঠেছে: "সকলের জন্যে রুটি চাই, ১৭৯৩-এর গঠনতন্ত্র চাই।"

ফরাসী বিপ্লব মূলত সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত উচ্ছেদ সাধন করেছে। রোমান-ক্যাথলিক পাদরী-পুরুতদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। একচ্ছত্র রাজার মাথা খসিয়েছে। বুর্জোয়া ধনিকদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে।

এর মানে যে শোষণের অবসান ঘটলো তা মোটেই নয়। আসলে অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষমতার সঙ্গে তাল রেখে ধনিকরা রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসলো। মজুরের পরিশ্রমের ভিত্তিতে ধনিকের মুনাফার যে শোষণ, সে ব্যবস্থা পাকা হলো। কিন্তু এটাও ঠিক যে সমাজের মূল কাঠামোটাও বদলেছে: অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ সম্প্রসারিত হয়েছে; আর সামন্ততান্ত্রিক রাজদণ্ডের পতন ঘটাবার জন্যে যে সব স্বাধীনতা ও মুক্তির ব্যবস্থা বুর্জোয়ারা চেয়েছিলো তা ওপরতলা ছাড়া নিচের তলাতেও কিছুটা পৌঁছেছে। আর সকলের জন্যে রয়ে গেছে এক বিপ্লবী

ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য সকল মানুষের সমানাধিকারের কথা বলেছে, যা প্রাচীন সংস্কারের অচলায়তনকে আমূল উপড়ে ফেলেছে, যার মুখপাত্র ড্যানটন ঘোষণা করেছেন : "চাই দুঃসাহস, আরও দুঃসাহস, আরও, আরও দুঃসাহস"—যার অপর মুখপাত্র রোব্‌স্‌পিয়ার শত প্রলোভনের মাঝেও অপাপবিদ্ধতার চূড়ান্ত নিদর্শনরূপে ইতিহাসের পাতায় বিরাজমান।

॥ আরো এক বিপ্লব ॥

সাবেক কালের সমাজে মানুষ যেভাবে জীবনধারণের ব্যবস্থা করতো কয়েক শো বছর ধরে তার ছাঁদে রদবদলের লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো। এই রদবদল মোটেই একটা তুচ্ছ, মামুলি ব্যাপার নয়। কারণ ইউরোপের দেশগুলিতে সেদিন যে বাণিজ্যবিস্তার, সমুদ্রপথ আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টির প্রতিষ্ঠা, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, শিল্পসাহিত্যের জোয়ার, এমনকি রাষ্ট্রবিপ্লব পর্যন্ত নানা চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটছিলো, তার গোড়ায় ছিলো ঐ রদবদল।

এর আরো একটা চোখ-ঝলসানো রূপের কথা এখন বলবো।

আঠারো শতকে ইংল্যাণ্ডেই প্রথম শুরু হয় শিল্পবিপ্লব। কিন্তু উনিশ শতকে তার চেহারা এমন আশ্চর্য রকম বিপুল ও প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায় যে 'বিপ্লব' নামের সার্থকতা বেশ জানান দিতে থাকে।

শিল্পবিপ্লব ব্যাপারটা কী?

এর প্রথম কথা হলো : মান্ধাতার আমলের সেকেলে যন্ত্রপাতির বদলে নতুন ঢঙের উন্নত কলকব্জা ব্যবহার। আঠারো

শতকের মাঝামাঝি থেকে, বিশেষ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ইংল্যাণ্ডে নিত্যনতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হতে থাকে। কে, হারগ্রিভস, আর্করাইট, ক্রমটন, কার্টরাইট-এর মতো বিজ্ঞানী একের পর এক অভিনব সুতোকাটা বা কাপড়বোনার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের কাহিনী আমরা শুনেছি। সেই বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জর্জ ষ্টিফেনসন তৈরি করলেন রেলএঞ্জিন। শুধু রেলগাড়ি মারফত ডাঙায় নয়, পাল-তোলা বা দাঁড়টানা জাহাজের জায়গায় বাষ্পশক্তিচালিত জাহাজও এবার দরিয়া পাড়ি দিতে লাগলো। তা ছাড়াও লোহা গালাবার বা ইস্পাত তৈরির নতুন কায়দা আর কয়লা তোলার উন্নত কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে দেখতে দেখতে সারা দেশ জুড়ে গড়ে উঠতে লাগলো নতুন নতুন মস্তো মস্তো কারখানা—দেশ বিদেশে ফেঁপে উঠলো ব্যবসা-বাণিজ্য।

অমন তাজ্জব ব্যাপার ঠিক ঐ সময়েই, আর সব দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডেই বা ঘটলো কেন? বেশ জনকয়েক মাথা-ওয়ালা লোক হঠাৎ তাক করে ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন বলেই কি?

আসলে তা নয়। ইংল্যাণ্ডে যে ঐ সময়ে শিল্পবিপ্লব ঘটলো তার কারণ, বেশ কিছুদিন থেকেই সে দেশে এর আসর তৈরি হচ্ছিলো। সতেরো শতকে ক্রমওয়েলের সময়কার রাষ্ট্র-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে যে শাসনব্যবস্থা ও সমাজ গড়ে ওঠে তা অন্য সব দেশের মতো নতুন যন্ত্রপাতি বা কৌশল খাটাবার পথে বাধা সৃষ্টি তো করেইনি বরঞ্চ তার সুযোগ ঘটিয়েছিলো অনেক-খানি। তবু ঐ বিপ্লবের ঠিক পরেই শিল্পবিপ্লব ঘটেনি, আরো

প্রায় এক শো, দেড় শো বছর লেগেছিলো তা ঘটতে। ঐ সময়ের মধ্যেও বেশ কিছু আবিষ্কার হয়েছিলো ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু ইংরেজ সমাজ তখন তার খবর করে নি। সেগুলি তাই ক্রমশ চাপা পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। এমনটা হতে পেরেছিলো এই জন্যেই যে সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকখানি অনুকূল হলেও ঐ সব আবিষ্কারকে বড়ো বড়ো কারখানা গড়ার কাজে লাগানোর পথে তখনও আরো একটা মস্তো বাধা ছিলো। সেটা হলো, ঐ ধরনের বড়ো শিল্পপত্তনের জন্যে গোড়াতে যে বেশ মোটা পুঁজি লাগে তার অভাব।

সেই মোটা পুঁজি জোগাড় হলো স্পেন, পর্তুগালের মতো শাঁসালো প্রতিদ্বন্দ্বীর সোনাভরা জাহাজ লুট করে, দেশবিদেশে বেশ ফলাও রকম দাসব্যবসা ফেঁদে আর বিশেষ করে এই আমাদের মতো দেশে খোলাখুলিভাবে বা বাণিজ্যের ছুতোয় অবিশ্রাম বাটপাড়ি চালিয়ে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং বলেছেন "ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্যের দিকে যখন তাকাই তখন অবাক হই আমার লোভসংবরণের ক্ষমতার কথা ভেবে।" এ প্রসঙ্গে মনে রেখো, এই লোভজয়ী মহাপুরুষ এ দেশ থেকে মাত্র লাখ পঁচিশ টাকা আর বছরে বেশ কয়েক লাখ টাকা খাজনা উশুল হয় এমন জায়গীর হাতসাফাই করেন! এ ধরনের সরাসরি লুটবাটপাড়ি ছাড়াও বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা এ দেশ থেকে বিলেতে চালান যায় বাণিজ্যের অছিলায়। কিন্তু তার পিছনে যে ঠকামি, জালজোচ্চুরি, জুলুম, জবরদস্তি ছিলো তার ফলে আসলে তা ছিলো ডাকাতিরই সামিল।

এই লুটের খপ্পর থেকে সেদিন ইংল্যাণ্ডের চাষীরাও বাদ পড়েনি। পশম ব্যবসার বাজার গরম হওয়ায় বড়ো বড়ো জমির মালিক ভেড়া চরাবার জন্যে অম্লানবদনে হাজার হাজার বিঘা জমি কেড়ে নেয় গরিব চাষীদের কাছ থেকে।

এইভাবে সারা আঠারো শতক জুড়ে দেশবিদেশের মানুষের যথাসর্বস্ব লুটেপুটে অবশেষে ঘুরতে শুরু করে ইংল্যাণ্ডের কলের চাকা। শিল্পবিপ্লবের এই জন্মবৃত্তান্তটা আমাদের পক্ষে কোনো-মতেই ভোলা সম্ভব নয়।

যাই হোক, এর থেকে বোঝা যায় যে, ইংল্যাণ্ডের পুরানো সমাজের বুকে কয়েক শো বছর ধরে যে অদলবদল চলছিলো, শিল্প-বিপ্লব আসলে তারই একটা চূড়ান্ত রূপ। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন-গুলো যে শিল্পপত্তনের কাজে লাগতে পারলো আর তাই আরো নতুন উদ্ভাবনের পথ খুলে দিলো—তার কারণ ঐ কয়েক শো বছরের পরিবর্তন।

এর থেকে বুঝতেই পারছো, নতুন যন্ত্রপাতি বা উন্নত নির্মাণ-কৌশল উদ্ভাবনই শিল্পবিপ্লবের সবটুকু নয়। ঐ সব জটিল, সত্যি-কার কলকব্জার কাজ বা উন্নত কৌশলের প্রয়োগ সেকেলে ঢঙে ঘরে বসে তাঁত বা তকলি চালাবার মতো করে কিছুতেই চলতে পারে না। তার জন্যে এক জায়গায় অনেক লোককে জোট বেঁধে গতর খাটাতে হয়। এবার তাই শুরু হলো বড়ো বড়ো কার-খানায় হাজার হাজার মানুষের জোটবাঁধা খাটুনি। চাষের কাজেও যন্ত্র ব্যবহার চলতে পারে যদি ছোটো ছোটো, টুকরো টুকরো জমির বদলে খামার হয় একটানা, বেশ বড়ো মাপের। সে

ব্যাপারই ঘটতে লাগলো এবার ক্রমেই বেশি বেশি মাত্রায়।

একে নতুন, উন্নত যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ-কৌশল, তায় আবার এই রকম অতিকায় মিলকারখানা বা বিরাট আকারের চাষের খামার—ফলে রাশি রাশি মালপত্র তৈরি হতে লাগলো প্রতিদিন। সে মালের দরও তাই আগের থেকে সস্তা হলো বেশ কিছুটা। আগের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় যে এই হঠাৎ-বেড়ে-ওঠা মালপত্রের পরিমাণ কী আশ্চর্য রকম। যেমন ধরো, ১৮৩০ সালে ইংল্যাণ্ডে তৈরি হতো ৭½ লক্ষ টন লোহা। ১৮৭০ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ালো ৬০ লক্ষ টনে—অর্থাৎ ঠিক আটগুণ বেশি। মানুষের জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি উপকরণই এইভাবে আগের থেকে ঢের বেশি মাত্রায় তৈরি হতে লাগলো। ফলে দেখতে দেখতে সে মাল ছড়িয়ে পড়লো দেশবিদেশের হাটবাজারে।

রক্তাক্ত জন্মবৃত্তান্ত সত্ত্বেও তাই মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের দান অনেকখানি।

॥ নয়া ব্যবস্থার রূপ ॥

শিল্পবিপ্লবের ফলে যে ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডে বেশ পাকা হয়ে উঠলো তার চেহারাটা কেমন ?

বাজারে রাশি রাশি সস্তা মাল আসাতে নিশ্চয়ই ক্রেতাদের বেশ সুবিধে হলো। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে-সব কারিগর সেকেলে ঢঙে ঐ ধরনেরই মালপত্র বানাতো তাদের কথাটাও মনে রাখা দরকার। বুঝতেই পারছো, অতিকায় মিলকারখানার প্রচণ্ড দাপটে সেদিন হাজার হাজার কারিগরকে স্বাধীন ব্যবসার পাত-

তাড়ি গোটাতে হলো। এদের অনেকেই একেবারে পথে বসলো। তবে ইংল্যাণ্ডে কলকারখানা তখন বাড়তির মুখে। তাই অশেষ তুর্গতি সত্ত্বেও এককালে যারা ছিলো স্বাধীন কারিগর তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত নতুন নতুন কারখানায় ঠাঁই পেলো শ্রমিক হিসেবে। সর্বস্বান্ত চাষীরাও অনেকে ভিড়লো শ্রমিকের দলে।

সমাজের আসরে এইভাবে আবির্ভূত হলো নতুন এক ধরনের মানুষ—শ্রমিক। আগেকার দিনের ছোটোখাটো কারখানায় ওস্তাদ কারিগরদের যে তু-চার জন করে সাকরেদ থাকতো, এরা আবার তাদের মতো নয়। বড়ো বড়ো কারখানায় এরা শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে জড়ো হয়ে এখন ঘোরাতে লাগলো কলের চাকা। সে কলও আবার কোনো ওস্তাদ কারিগরের নয়—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার কুমির পুঁজিদারের সম্পত্তি।

অর্থাৎ একদিকে সর্বস্ব-খোয়ানো শ্রমিক আর একদিকে পুঁজি-দার মালিক—এই হলো নতুন ব্যবস্থার আসল কথা। এ ব্যবস্থায় শ্রমিককে নেহাত টিকে থাকার তাগিদেই দ্বারস্থ হতে হলো মালিকের : খেটে খাওয়ার হাত তুখানা ছাড়া তাদের সম্পত্তি বলতে তো আর কিছুই নেই। কারখানায় ভর্তি হয়ে তাই তারা মালিকদের কাছে বেচতে লাগলো ঐ মেহনত করার শক্তিকেই। মালিকের : যন্ত্রপাতিতে গতর খাটিয়ে তারা যে-সব মালপত্র বানাতে লাগলো তা কিন্তু আর তাদের সম্পত্তি নয়, মালিকেরই সম্পত্তি। তারই কিছুটা থেকে উশুল হলো কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি আর শ্রমিকদের গতর খাটানোর শক্তির দাম। (ঐ শেষেরটাই হলো মজুরি অর্থাৎ শ্রমিকদের কোনোক্রমে সপরিবারে

টিকে থাকার মতো আয়)। এর ওপরে উপরি বা বাড়তি যা কিছু রইলো সবই হলো মালিকের মুনাফা। এই মুনাফার পরিমাণ এতো বেশি যে মালিক সপরিবারে খাওয়াপরার ছড়াছড়ি করেও তার অল্প এক অংশও ফুরোতে পারে না। তাই তার মোটা অংশটাই পরিণত হয় নতুন পুঁজিতে। অর্থাৎ আরো যন্ত্রপাতি ও মজুর খাটিয়ে, আরো কাঁচামাল ব্যবহার করে মালিক আগের থেকেও মোটা অঙ্কের মুনাফা কামাতে থাকে—ফুলে ফেঁপে দিনদিন লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠে।

তাই শুধু নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি বা নির্মাণকৌশলই নয়, তারই সঙ্গে সঙ্গে সমাজে আসর জাঁকিয়ে বসলো এই নতুন ধরনের ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকেরা এরই নাম দিয়েছেন ধনতন্ত্র।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকদের (সহজে চেনবার জন্যে আমরা এদের নাম দিতে পারি 'ধনিক') যে পোয়াবারো তা তো বুঝতেই পারছো। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের আমলে শ্রমিকদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা রইলো না। আলো-বাতাসের নামগন্ধ নেই এমন দম-আটকানো কারখানাঘরে তাদের পনেরো, ষোলো, এমন কি উনিশ-কুড়ি ঘণ্টাও অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। আর কম মজুরি দেওয়া যায় বলে মেয়েদের আর তোমাদের মতো ছোটোদেরও ঐ রকম কাজে লাগানো হতে লাগলো আখছার! কাজে গাফিলতি বা অন্য কোনো ছুতায় শ্রমিকদের যৎসামান্য মজুরি থেকে দরাজ হাতে কাটা হতো জরিমানা। তার ওপরে মারধোরও চলতো অবাধে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর শ্রমিকেরা হাড় জুড়োতে আসতো যে বস্তির ঘরে, তার অবস্থাও

ছিলো নরকের মতন।

শোষণ আর জুলুম এমন অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো যে শ্রমিকেরা আর মুখ বুঁজে তা বরদাস্ত করতে পারছিলো না। মরিয়া হয়ে ১৮১১ সাল নাগাদ তারা যন্ত্রপাতি ভাঙতে শুরু করে। কারণ অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে তারা ভেবেছিলো ঐ যন্ত্রপাতির থেকেই বুঝি তাদের সমস্ত দুঃখদুর্দশার উদ্ভব, ওগুলোই বুঝি তাদের আসল দুশমন। যাই হোক, নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে সেদিন দাবানো হয় তাদের এই যন্ত্রভাঙাভাঙি। কিন্তু ধনিকেরা এর থেকে এও বুঝতে পারে যে শোষণের মাত্রা কিছুটা অন্তত না কমালে বারেবারে এই রকমই ঘটতে থাকবে—সমস্ত ব্যবস্থাটাই হয়তো ভেঙে পড়বে তার ফলে। তাই কারখানা আইন জারি করে শ্রমিকদের খাটুনির ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হলো। তাদের আপন স্বার্থরক্ষার জন্যে জোট বাঁধার অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকারও ইংল্যাণ্ডে মেনে নেওয়া হলো ১৮২৫ সালে। এ সবের ফলে উৎকট রকমের জুলুমবাজি কিছুটা কমলেও শোষণ থামলো না মোটেই।

কাজেই মানুষের জীবনযাত্রার নানা উপকরণ জোগানোর দিক থেকে শিল্পবিপ্লব আশ্চর্যরকম ফলপ্রসূ হলেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের দারিদ্র্য বা শোষণের মোটেই অবসান ঘটলো না। বরঞ্চ ধনী-নির্ধনের ফারাকটা আরো প্রকট হয়ে উঠলো দিনকে দিন।

।। চিন্তাজগতেও ওলটপালট।।

আর একটা দরকারি কথা। নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি বা

পদ্ধতি আবিষ্কার আর সমাজে তার বেশ ফলাও রকম প্রচলনের দরুন মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার রাজ্যেও সাড়া পড়ে গেলো। মধ্যযুগে সমাজ বা বিশ্বজগৎ মানুষের চোখে মনে হতো অচল, অনড় একটা চিরন্তন ব্যাপার। কিন্তু নতুন হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে এখন প্রচণ্ডবেগে রাশি রাশি মাল তৈরি হতে লাগলো। আর তারই জের ধরে সমাজেও শুরু হলো বেশ বড়োরকমের ওলটপালট। এ সবের ফলে মানুষের চিন্তাভাবনাও বদলাতে লাগলো। 'যেমন ছিলো তেমনই থাকবে চিরকাল', 'মানুষ অদৃষ্টের হাতে খেলার পুতুল' এই ধরনের হালছাড়া চিন্তার স্থান নিলো 'মানুষ বিজ্ঞানের জোরে অসম্ভবকে সম্ভব করতে, দুনিয়াকে জয় করতে পারে, তাই তার উন্নতির সীমা পরিসীমা নেই'—এই রকমের ভাবনা। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো অচল, অনড়ের জায়গায় গতিশীলতার ধারণা, আজগুবি, অলৌকিকের বদলে বৈজ্ঞানিক, বাস্তব চিন্তা। দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাপ পড়লো এই পরিবর্তনের। এ সবের পুরো খবর বলতে গেলে মোটা বই লিখেও কূল পাওয়া যাবে না। এখানে তাই বাছাই করে দু-একটা বড়ো রকমের দৃষ্টান্তই তোমাদের কাছে হাজির করবো।

চার্লস ডারউইনকে তাঁর ইংরেজ অভিভাবকেরা পাঠালেন পাদ্রি হওয়ার জন্যে। ছেলের কিন্তু শখ জীবজন্তু, পোকামাকড়ের খোঁজখবর করাতেই। অমন উদ্ভট খেয়াল কোনো বাপ-মাই বা বরদাস্ত করতে পারেন? তাই চললো অনেক পীড়াপিড়ি, ধমকানি, চোখরাঙানির পালা। ছেলে তবু অটল। শেষ পর্যন্ত

হাল ছেড়ে অভিভাবকেরা রাজি হলেন ছেলেকে 'বিগল' নাম এক জাহাজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে দিতে।—ছেলে নাকি দেশে দেশে জীবজন্তু-পোকামাকড়ের তল্লাসি করবে!

ভবঘুরে ডারউইন জাহাজে ঘুরলেন পাঁচ বছর। তার পর তেইশ বছর ধরে নানা জীবজন্তু, পোকামাকড় ঘাঁটলেন, অনেক মাথা ঘামালেন তাদের সম্পর্কে। অবশেষে আটাশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৫৯ সালে তিনি প্রকাশ করলেন এক বই।

তাজ্জব সে বই। দেখতে দেখতে টি টি পড়ে গেলো সমাজে। যে পাদ্রি হওয়ার হাতেখড়ি নিতে গিয়েছিলেন একদিন ডারউইন, সেই পাদ্রিরাই 'মার মার' করে উঠলো সব চাইতে বেশি। কিন্তু কেন এতো হৈচৈ, গণ্ডগোল?

কারণ ডারউইন তাঁর বইতে অসংখ্য নজির তুলে তুলে প্রমাণ করলেন যে পৃথিবীতে যে সব অসংখ্য জীবজন্তু, পোকামাকড় দেখা যায় তাদের গোড়ার থেকেই আলাদা আলাদা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেনি কেউ। এই জীবজন্তুরা বাস করে যে প্রাকৃতিক অবস্থার ভেতরে, তার অবিশ্রাম পরিবর্তন ঘটেছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় এক ধরনের জীব বহু বছর পরে রূপান্তরিত হয়েছে আর-এক রকম জীবে। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে যারা একেবারেই পারেনি তারা বেমালুম লোপ পেয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। তেমনই যারা ভালো করে সে কাজ করতে পেরেছে তাদের সংখ্যা বেড়েছে অনেক গুণ। তারই ফলে পৃথিবীর বুকে দেখা দিয়েছে ক্রমশই জটিলতর, উন্নততর জীবজন্তু।

ডারউইন সেদিন যে সব প্রশ্ন তুলেছিলেন এখনও তার চূড়ান্ত জবাব হয়তো মেলেনি। কিন্তু জীবজগৎ কোনো অলৌকিক খামখেয়ালের দাস নয়, বাস্তব প্রাকৃতিক নিয়মেই যে তা চলে, জীবজগতে যে অবিশ্রাম পরিবর্তন ও রূপান্তর চলেছে আর পারিপার্শ্বিকের যে মস্তো প্রভাব রয়েছে জীবজন্তুর ওপর—ডারউইনই তা প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এ সব কিন্তু নিছক জ্ঞানের কথা নয়। কারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বেশি, ভালো রকমের ফসল, তরিতরকারি, জীবজন্তু পাওয়া না-পাওয়ার সরাসরি যোগ রয়েছে এই জ্ঞানের সঙ্গে।

আর-একটা আবিষ্কারের কথা বলি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখেছি সমাজে শুরু হয়েছে ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থের সংঘাত। এই ব্যবস্থার নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা প্রথম থেকে লড়াই করতে থাকে। সে লড়াই কখনও দাঁড়িয়েছে যন্ত্রপাতি তচনচ করাতে, কখনো বা অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়া বা ধর্মঘট করার মধ্যে তার প্রকাশ দেখা গেছে। ১৮৩৬ সাল থেকে বয়স্ক পুরুষমাত্রেরই ভোটের অধিকার, গোপন ভোট প্রভৃতি ছটি রাজনৈতিক দাবির তালিকা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের মজুরেরা প্রবল লড়াই চালায়—কখনো দাবির তালিকায় রাশি-রাশি সমর্থনসূচক সই জোগাড় করে, কখনো মিছিল বা বড়ো বড়ো সমাবেশ করে, কখনো বা রাস্তায় রাস্তায় পুলিস বা সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে। ইতিহাসে এ আন্দোলনের পরিচয়

চার্টিষ্ট আন্দোলন নামে।

এ ছাড়াও ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের যে বিপ্লবের কথা আমরা একটু পরেই শুনবো তাতেও দেখা যাবে শ্রমিকেরা লড়াই চালাচ্ছে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনার পথেঘাটে।

শ্রমিকদের এই সব নির্ভীক সংগ্রাম কিন্তু সেদিন পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। অনেক সময়েই প্রবল অত্যাচার করে শাসকেরা ঐ আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে পেরেছে, অন্তত কিছু-দিনের মতো। এর মস্তো বড়ো কারণ শ্রমিকেরা তখনো তাদের সঠিক পথের সন্ধান পায়নি।

সেই পথেরই নিশানা দিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। এঁরা ছিলেন জার্মান কিন্তু ঘটনাচক্রে দুজনকেই জীবনের শেষের দিকে অনেকগুলো বছরই কাটাতে হয় ইংল্যাণ্ডে। সেখানে তাঁরা খুঁটিয়ে বিচার করেছিলেন নতুন সমাজব্যবস্থার খুঁটিনাটি। তারই ফলাফল তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের অসংখ্য রচনায়।

ডারউইনের বইয়ের থেকে মোটেই কম তোলপাড় উঠলো না এর ফলে সমাজে। সত্যি কথা বলতে কি, সে তোলপাড়ের আজো শেষ হয়নি।

মার্কস ও এঙ্গেলস কী এমন কথা বলতে চেয়েছিলেন যার জন্যে এতো কাণ্ডকারখানা? তাঁরা বলেছিলেন: সমাজে শোষণ থাকবে না, মানুষ মানুষের সমান হবে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তো কতো মানুষ এই সাম্যের কথাই বলেছে, এরই স্বপ্ন দেখেছে। এমন কি ধনতান্ত্রিক সমাজ পত্তনের মুখেও তো বাবুফের মতো বিপ্লবী এই সাম্যের জন্যেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, ব্লাঙ্কি ছত্রিশ

বছর কাটিয়েছিলেন জেলে জেলে। সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের, রবার্ট ওয়েন-এর মতো মানুষেও তো নতুন ব্যবস্থার আশ্চর্যরকম তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে স্বপ্ন দেখেছিলেন সত্য ও ন্যায়ের ওপরে প্রতিষ্ঠিত আর-এক সমাজের।

কিন্তু এঁদের সবারই সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর ছিলো মস্তো তফাত। তাঁরা শুধু সাম্যের স্বপ্নই দেখলেন না বা নিজেদের সাম্যচিন্তায় দীক্ষিত করে ধনিকদের মন গলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তাঁরা দেখালেন যে সমাজ চিরকাল এক রকমের থাকে না, তার অদলবদল, ওলটপালট হয়। সে ওলটপালট খামাখা অকারণে ঘটে না। মানুষের জীবনধারণের যে সব উপকরণ লাগে তা তৈরি করার রীতি বদলানোর সঙ্গে সমাজের অদলবদলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই অদলবদল নির্বিঘ্নে, বিনা গণ্ডগোলে হয় না। প্রভু-দাস, জমিদার-কৃষক, ধনিক-শ্রমিক এই ধরনের বিরোধী শ্রেণীর লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই হয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে পরের পর আদিম সাম্যবাদী, দাস ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পর এখন আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজ পৌঁছেছি। কিন্তু সমাজ-রূপান্তরের যে নিয়মের কথা বলা হলো তারই ফলে এ-সমাজও টিঁকবে না। তার জায়গায় আসবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এই রূপান্তর ঘটবে ধনতান্ত্রিক সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী ধনিক ও শ্রমিকের লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে। আসলে মজুর-শ্রেণীই ঘটাবে সে রূপান্তর। তাই মজুরশ্রেণীকে সংঘবদ্ধ ও সচেতন করাই হলো সাম্যবাদীদের কাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজকে

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করার কাজে তুনিয়ার সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থ এক। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস মজুরদের ডাক দিলেন : "তুনিয়ার মজুর এক হও।"

অর্থাৎ ডারউইন যেমন জীবজন্তু, পোকামাকড়ের খুঁটিনাটি বিচার করে প্রতিষ্ঠা করলেন জীববিজ্ঞানের নিয়ম, মার্কস ও এঙ্গেলসও তেমনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিচার করে পত্তন করলেন সমাজবিজ্ঞানের কানুন।

॥ দেশবিদেশে নতুন ব্যবস্থার প্রসার ॥

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো নানা দেশবিদেশে। সব দেশে কিন্তু একই সময়ে বা একইভাবে তার প্রসার ঘটেনি—তার ফলাফলও এক রকমের দাঁড়ায়নি। নানা রকমফের দেখা গেছে নানান দেশে।

ইংল্যাণ্ডে সতেরো শতকের বিপ্লবের ফলেই দেশশাসনের ভার এসে পড়েছিলো বণিক, মহাজন ও পুঁজিদার জমির মালিকদের হাতে। তবে এর দেড় শো বছর পরে ফ্রান্সে যেমনটি হয়েছিলো এখানে তেমন করে বনেদী বংশের কুলতিলকদের বেমালুম ঝেঁটিয়ে খেদানো হয়নি। কিছুটা বরং মিটমাটই করা হয়েছিলো তাদের সঙ্গে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেশ কায়েম হয়ে বসলো। এর প্রধান নায়ক ছিলো যে কলকারখানার মালিকেরা, উন্নত যন্ত্রপাতির মালিকানার জোরে তারা প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে ক্রমশই সমাজের মাতব্বর হয়ে উঠছিলো। অথচ গোড়ায়

গোড়ায় দেশশাসনের ব্যাপারে এদের তেমন হাত ছিলো না। এমনকি নতুন শিল্পপত্তনের ফলে যে সব ঘনবসতি শহর গড়ে উঠেছিলো তার বাসিন্দাদের পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাবার ভোটাধিকারও ছিলো না। অথচ ঐ শহরগুলিই ছিলো শিল্পপতিদের ঘাঁটি। কারখানা-মালিকেরা তাই হৈ চৈ শুরু করলো : শহরগুলিকে ভোটের অধিকার দিতে হবে। ভোটের লোভ দেখিয়ে তারা এ আন্দোলনে মজুর ও শহরের গরিব মানুষদেরও টানলো। এ সবের দরুন ১৮৩২ সালে পাশ হলো ভোটাধিকার সংস্কার আইন। কিন্তু শ্রমিক বা শহরের সাধারণ মানুষের কিছুই সুবিধে হলো না এই আইনে। কেননা নতুন আইনে সাব্যস্ত হলো, যে সব শহরবাসী বছরে অন্তত ১৩৫৲ টাকার মতো বাড়িভাড়া দিয়ে থাকে শুধু তারাই হবে ভোটের অধিকারী। বুঝতেই পারো, তখনকার দিনে অতো টাকা ভাড়া দেবার মতো লোক অল্পই ছিলো। আসলে তাই মাত্র ১,৩০,০০০ ভাগ্যবান লোকেরই জুটলো ভোটের অধিকার।

তবে কারখানা-মালিকদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হলো এ আইনের ফলে। আসলে দেশশাসনের ব্যাপারে এতে করে প্রতিষ্ঠিত হলো তাদেরই প্রতিপত্তি।

ফরাসী দেশে কিন্তু নতুন ব্যবস্থা অতো সহজে হলো না যদিও ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের ফলে সেখানে শাসনকর্তৃত্বের রাশ সাবেক আমলের বনেদী বংশের মুঠো থেকে বণিক, ব্যবসায়ী, মহাজনদের মতো নতুন ধরনের বড়োলোকদের হাতেই পৌঁছোয়। নেপোলিয়নও ঐ ব্যবস্থাকেই মজবুত করে তোলেন। তিনি দেশে

যে সব আইন চালু করেন তার মূল কথা ছিলো নতুন ধরনের ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি কী করে রক্ষা করা যায় তারই খুঁটিনাটি ব্যবস্থা। শুধু দেশেই নয়, নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী যখনই কোনো দেশ জয় করেছে তখনই সেখানেও চালু করেছে ঐ আইন। ফলে সাবেককালের ভূমিদাসপ্রথা হয় একেবারে উঠে গেছে নয়তো বা খুবই ঘা খেয়েছে, বন্ধ হয়েছে সেকেলে জমিদারদের নানা ছুতোয় জবরদস্তি নজরানা আদায় আর ব্যবসায়ীরা পেয়েছে খুশিমতো কেনাবেচা করার অধিকার। অর্থাৎ শুধু ফ্রান্সে নয়, ইউরোপের নানা দেশেও সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জাল হটিয়ে নতুন ব্যবস্থা পত্তনের পথ পরিষ্কার করেন নেপোলিয়ন।

নেপোলিয়নের অভিযানের ফলে আরো এক দিক থেকে নতুন ব্যবস্থা কায়েমের সুবিধে হয়। আমরা আগেই দেখেছি: ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সারা দেশ জুড়ে একটি জাতীয় বাজার ও বেশ জোরদার এক জাতীয় রাষ্ট্রগঠন কতোখানি প্রয়োজন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অসংখ্য অব্যবস্থা, জবরদস্তি ও অপদার্থতার বিরুদ্ধে কয়েক শ বছর ধরেই ইউরোপের নানা দেশে নানা ধরনের প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠছিলো তাও আমরা দেখেছি। তারই ফলে সে সব দেশের মানুষের মনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের চিন্তা ক্রমেই পরিস্ফুট হচ্ছিলো। নেপোলিয়নের বাহিনী এ সব দেশ জয় করে ও তাদের উপরে জবরদস্ত শাসন প্রতিষ্ঠা করে খুঁচিয়ে তোলে তাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম। দেশে দেশে দুর্বার হয়ে ওঠে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

নেপোলিয়নের রাজত্বের শেষ দিকে এই সদ্যজাগ্রত

জাতীয়তাবাদ তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে থাকে। অন্যদিকে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়ার মতো ইউরোপের সামন্ত-তান্ত্রিক রাজারাজড়ারা পুরানো আমল ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বাঁধে। ফরাসী দেশে ধনতন্ত্র পুরোপুরি কায়েম হলে তাতে নিজেদের বাণিজ্য ও দরিয়ার ওপর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে ইংল্যাণ্ডও জোটে এদের সঙ্গে। ১৮১৪ সালে এদের হাতেই শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় নেপোলিয়নকে। তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শাসকেরা নেপোলিয়নের বিপুল সাম্রাজ্যের বিলিব্যবস্থা করে। এর আসল উদ্দেশ্য হলো পুরনো ব্যবস্থাকে জোর করে টিঁকিয়ে রাখা ও যেখানে তা ধ্বসে পড়েছিলো সেখানে যতোদূর সম্ভব তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তারই জন্যে ফ্রান্সের সিংহাসনে আবার চাপানো হলো বুরবোঁ বংশের রাজাকে। এও ঠিক হলো যে বিদ্রোহ করে এই বিলি-ব্যবস্থা ওলটপালটের কোনো চেষ্টা হলে সবাই মিলে তা রোখা হবে। ইতিহাসের নিয়মে বাতিল, সাবেকী ব্যবস্থাকে এইভাবে রাজারাজড়াদের তরফ থেকে জবরদস্তি ফিরিয়ে আনার চক্রান্তই ইতিহাসে 'পবিত্র মৈত্রী' নামে পরিচিত। এর প্রধান পাণ্ডা ছিলেন রাশিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট প্রথম আলেকজাণ্ডার ও অষ্ট্রিয়ার কূটচক্রী প্রধান মন্ত্রী মেটারনিশ।

কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু বেশ বোঝা গেলো যে এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যবস্থা কিছুতেই টিঁকতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের ছিলো বিরাট সাম্রাজ্য। ১৮২০ সাল নাগাদ সেখানে সাইমন বলিভার নামে একজন দেশপ্রেমিকের নেতৃত্বে

বিদ্রোহ শুরু হয়। একা ঐ বিদ্রোহের সামাল দিতে না পেরে স্পেন 'পবিত্র মৈত্রী'র দোহাই তুলে ইউরোপের রাজারাজড়াদের সাহায্য চায়। মেটারনিশ রাজি ছিলেন সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করতে। কিন্তু বেঁকে বসলো ইংল্যাণ্ড। সে দেখলো ঐভাবে জাহাজ করে সৈন্য চলাচল শুরু হলে দরিয়ার বুকে তার আধিপত্য আর টিঁকবে না, তার বাণিজ্যও ক্ষুণ্ণ হবে। সে তাই মেটারনিশের প্রস্তাবে আপত্তি জানালো। শুধু তাই নয়, তারই উসকানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মন্‌রোও ঘোষণা করলেন যে পশ্চিম গোলার্ধে এভাবে ইউরোপের নাকগলানো তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। অগত্যা নিরস্ত হতে হলো মেটারনিশকে। তার ফলে বলিভারের নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকা যেমন একদিকে মুক্তি পেলো স্পেনের নাগপাশ থেকে, তেমনিই আবার 'পবিত্র মৈত্রীর' ইমারতে প্রকট হয়ে উঠলো মস্তো ফাটল।

'পবিত্র মৈত্রীর' অস্বাভাবিক ব্যবস্থা কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়লো ১৮৪৮ সালের বিপ্লবী ঝঞ্ঝায়। এর আগে ১৮৩০ সালের এক বিপ্লবে বুরবোঁ বংশ ফ্রান্সের সিংহাসন থেকে আবার বিতাড়িত হয়েছিলো। তবে তখন তার বদলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অরলিয়ান্স বংশের লুই ফিলিপ্পিকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেশ শাসনের ভার ধনিকদের এক অংশের মধ্যে কিছুটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৮৪৮ সালে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। এর সূত্রপাত প্যারিসের রাস্তায়। কিন্তু দেখতে দেখতে বিপ্লব অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, হাঙ্গেরি, ইটালি—ইউরোপের প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে

পড়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে প্যারিসের মজুর, ছাত্র ও জনসাধারণ তিনদিন লড়াইয়ের পর সিংহাসনছাড়া করলো লুই ফিলিপ্পিকে। তার জায়গায় ঘোষিত হলো নতুন এক প্রজাতন্ত্র। দেশ-শাসনের জন্যে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো তাকে গোড়ায় গোড়ায় সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া, অধিকার বেশ কিছুটা মেনে নিতে হলো। এমন কি তাদের কয়েকজন আস্থাভাজন প্রতিনিধি অস্থায়ী সরকারের সদস্যও হলেন। তবে তার আসল কর্তৃত্ব রইলো ধনিকদের মুঠোয়।

১৮৪৮ সালের মার্চ মাসে বার্লিনে ও ভিয়েনাতেও বিপ্লব শুরু হয়। দেখতে দেখতে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে অন্য জার্মান রাজ্য-গুলিতেও। 'পবিত্র মৈত্রীর' অন্যতম প্রধান পাণ্ডা স্বয়ং মেটার-নিশকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। অষ্ট্রিয়ার শেকলে বাঁধা হাঙ্গে-রিয়ান, ইটালিয়ান, চেক, পোল প্রভৃতি জাতিরা ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার ডাকে একদিন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। নেপোলিয়নের জবরদস্ত শাসনে তাদের স্বাধীনতার কামনা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লব তাই দেখতে দেখতে এদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইটালিতে গ্যারিবলডি-মাতসিনি আর হাঙ্গেরিতে কসুথ-এর মতো দেশপ্রেমিকের পরিচালনায় স্বাধীন সরকারও গঠিত হয় দুই দেশে।

১৯৪৮-এর জুন মাসের পর থেকে কিন্তু বিপ্লবী স্রোতে ভাঁটা দেখা দেয়। ধনিকদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধতা করতে থাকে—পাছে বিপ্লবী জোয়ারে তারা নিজেরাও ভেসে যায়। জুন

মাসে তাই নতুনপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় গুলি চালালো শ্রমিকদের ওপরে, চার হাজারেরও বেশি শ্রমিককে পাঠানো হলো দ্বীপান্তরে। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের ভাইপো লুই নেপোলিয়নকে চাপানো হলো ফ্রান্সের গদিতে—প্রথমে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও পরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে। তিনি কৃষক ও মধ্যবিত্তের সমর্থনে গদি পেলেও তাদের প্রতি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করেন। শ্রমিক দাবিয়ে রাখার ব্যাপারেও তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার ছিলো। কিন্তু বড়ো বড়ো ধনিকদের স্বার্থরক্ষার দিকে তাঁর নজর ছিলো খুবই সজাগ।

জার্মান রাজ্যগুলিতেও জুন মাসের পরে বিপ্লবের জোয়ারে ছেদ পড়ে। সেখানে ছোটোবড়ো রাজাদের সিংহাসন বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় কেঁপে উঠেছিলো। কিন্তু ও সব জায়গায় ধনিকেরা খুবই দুর্বল হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই রাজারা কিছুটা অধিকার কবুল করে তাদের হাত করে নেয়। তারপর সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া ডুবিয়ে দেওয়া হলো রক্তগঙ্গায়। অষ্ট্রিয়ার সম্রাটও প্রথম ধাক্কা সামলে ধনিকদের দলে ভিড়িয়ে নেন আর তারপর তাঁর সাম্রাজ্যের নানান জাতিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে স্বাধীন হাঙ্গারি ও স্বাধীন ইটালির সরকারকে ধ্বংস করেন।

১৮৪৮ সালের বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে ধনিকদের কর্তৃত্ব যে অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা আমরা আগেই দেখেছি। অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যেও ভূমিদাসপ্রথা এর ফলে খতম হয়। কৃষকেরা জমি ছেড়ে যেখানে খুশি যাবার বা জমি কেনা-বেচা করার অধিকার পায়। সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সার্ডি-

নিয়া, এমন কি প্রুশিয়াতেও স্বেচ্ছাচারী শাসনের জায়গায় অল্প-বিস্তার নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়।

অর্থাৎ ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে ১৮৪৮-এর বিপ্লব বেশ একটা বড়ো ধাপ। ধনতন্ত্র প্রসারের পথে যে সব বাধা ছিলো তার কিছুটা অপসারিত হওয়ায় সব দেশেই কল-কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। তার ফলে জার্মানি বা ইটালি ছোটোছোটো অসংখ্য রাজ্যের মধ্যে যেভাবে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পড়েছিলো (এদের প্রত্যেকের আপন আপন রাজা, আলাদা আলাদা শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা, নিজের নিজের ওজন ও মাপের মান, মায় স্বতন্ত্র বৈদেশিক সম্পর্ক পর্যন্ত ছিলো) তা দূর করে জার্মানি ও ইটালিতে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয় বাজার পত্তনের প্রয়োজন বেশি বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। এই তাগিদেরই চাপে ১৮৬১ সালে ইটালির ও ১৮৬৬ সাল নাগাদ জার্মানির জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে দেখা দেয় জার্মান ও ইটালিয়ান জাতীয় রাষ্ট্র। অবশ্য এই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাজারাজড়া-মন্ত্রীরাই বিশেষ করে তৎপর হওয়ায় দুই দেশেরই রাষ্ট্রব্যবস্থা অনেকটা সেকেলে ধরনেরই রয়ে গেলো। তবু পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের মাপকাঠিতে বিচার করলে পুরানো ব্যবস্থার তুলনায় নিশ্চয়ই এই জাতীয় ঐক্যপ্রতিষ্ঠা মস্তো বড়ো অগ্রগতি।

পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াও ধনতন্ত্রের ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারলো না। সেখানে একদিকে ভূমিদাসপ্রথা, অন্যদিকে জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র এমনভাবে গেড়ে বসেছিলো যে আঠারো শতকে জার

'পিটার দি গ্রেট' সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অদলবদল করার যে চেষ্টা করেন তা খুব বেশি এগোতে পারেনি। তবে সাবেকি ব্যবস্থা যে ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে একের পর এক ভূমিদাস বিদ্রোহ থেকেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো। প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়ে সেদিন দমানো হতো ঐ সব বিদ্রোহ। শুধু তাই নয়, 'পবিত্র মৈত্রীর' অন্যতম প্রধান পাণ্ডা হিসেবে জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের কাজ ছিলো সারা ইউরোপের পাহারাওয়ালাগিরি করা অর্থাৎ ভিন দেশেও বিদ্রোহের চেষ্টা হলে তখনই তার দমনের ব্যবস্থা করা।

তবু সমাজের রদবদল শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৮৫৩-'৫৬ সালে ক্রাইমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুর্কির কাছে হার মানার পর জারতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। এদিকে জনসাধারণের অসন্তোষও এমন হয়ে ওঠে যে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারও বুঝতে পারেন "ভূমিদাসপ্রথা নিচের থেকে খতম হতে শুরু হওয়ার আগেই বরং ওপর থেকে তা উচ্ছেদ করা ভালো।" তাই কোণঠাসা হয়ে ১৮৬৬ সালে তিনি ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘোষণা করেন। অবিশ্যি ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির মূল্য বাবদ ভূমিদাসদের কাছ থেকে আদায় করা হলো মাত্র ২০০ কোটি স্বর্ণরুবল! তাই তাদের ওপর জুলুম সামান্য কিছুটা কমলেও শোষণ কমলো না। তবু এরপর ধনতান্ত্রিক প্রসারের পথে সব থেকে বড়ো বাধা দূর হওয়ায় দেশে কলকারখানা বেশ কিছুটা বেড়ে উঠতে লাগলো।

শুধু ইউরোপেই নয়, নতুন ব্যবস্থা মার্কিন মুল্লুকেও ছড়িয়ে

পড়ে। ইংরেজদের কবল থেকে তাদের জোর করে বেরিয়ে আসার মধ্যেও প্রকারান্তরে ছিলো তারই পরোক্ষ চেষ্টা। ১৮০০ সালের পর থেকেই সেখানে আরম্ভ হয় কলকারখানা পত্তনের সূত্রপাত। ১৮৫০ সালে শিল্পজাত পণ্য মূল্যের দিক থেকে কৃষিজাত পণ্যকে ছাপিয়ে যায়। কয়লা বা তেলের উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে ওঠে। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গজিয়ে উঠতে থাকে ছোটোবড়ো ব্যাঙ্ক। ১৮৬০ সাল নাগাদ শিল্পের দিক থেকে সারা পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান দাঁড়ায় চতুর্থ।

বুঝতেই পারো এরই সঙ্গে সঙ্গে দেশে কলকারখানামালিকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিও ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু তাদের মস্তো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো দাসমালিকেরা। এরা হাজার হাজার নিগ্রো ক্রীতদাসকে পশুর মতো খাটিয়ে তুলো বা ঐ ধরনের শস্য আবাদ করতো। কিন্তু দাসদের মেহনতে আবাদ করানোর এই প্রথা কারখানামালিকদের যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিক পাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। বিশেষ করে এর ফলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার।

এরপর আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট পশ্চিম এলাকায় যখন বসবাস শুরু হলো তখন তার দখলদারি নিয়েও উত্তরের কলমালিকদের সঙ্গে দক্ষিণের দাসমালিকদের বিরোধ বাধলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে দাসমালিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব না করে দেশের শিল্পোন্নতি প্রায় অসম্ভব। তাই দাবি উঠলো দাসপ্রথা উচ্ছেদের। এ দাবির সঙ্গে দেশবিদেশের সত্যকার

মানব-হিতৈষীরাও সুর মেশালেন।

এই দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দাসমালিকেরা এ নির্বাচনে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে কিন্তু হাল ছাড়লো না। ১৮৬১ সালে তারা এক পাল্টা সরকার গড়ে বিদ্রোহ শুরু করলো সরকারের বিরুদ্ধে। শুরু হলো গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধের মধ্যেই লিঙ্কনের ঘোষণা অনুসারে ১৮৬২ সালে দাসপ্রথা উঠে যায়। ১৮৬৫ সালে প্রায় চার বছর রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত হার মানলো দাসমালিকেরা। দুর্ভাগ্যক্রমে এর পাঁচ দিনের মধ্যেই লিঙ্কন দাসমালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে নিহত হন।

গৃহযুদ্ধে দাসপ্রভুদের পরাজয়ের পর মার্কিন দেশে ধনতন্ত্র প্রসারের পথে আর কোনো বাধা রইলো না। এরপর সেখানে আগের থেকেও দ্রুতগতিতে কলকারখানা বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু যে নিগ্রোমুক্তির দাবিতে সেদিন গৃহযুদ্ধ চলেছিলো সেই নিগ্রোরা কি সত্যিই মুক্তির স্বাদ পেলো? নামমাত্র ছিটেফোঁটা সংস্কারের কথা বাদ দিলে তারা আসলে কী পেয়েছে তার প্রমাণ এমনকি আজকের দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেও ধরা পড়ে। অনেক দিক থেকেই আজো সেখানে নিগ্রোদের অবস্থা দাসেদেরই সামিল। তাই দাসদের মুক্তি ততোটা নয়, যতোটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসারের মাপকাঠিতেই মার্কিন গৃহযুদ্ধের সার্থকতা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

॥ এশিয়া-আফ্রিকায় ওলটপালট ॥

ধনতন্ত্রের দিগ্বিজয় কিন্তু শুধু ইউরোপ-আমেরিকাতেই আটক

রইলো না। সুদূর এশিয়া-আফ্রিকাতেও আছড়ে পড়লো তার ঢেউ। তবে মস্তো তফাত ঘটে গেলো এখানে। সে কথাই এখন বলবো।

আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসটাই ধরা যাক। এখানে যা ঘটেছে এশিয়া, আফ্রিকার অন্য সব দেশেও দেখা গেছে মোটের ওপরই একই জিনিস—হয়তো বা কিছুটা তারই রকমফের। আমাদের দেশের সঙ্গে ইংরেজ, ফরাসী পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের ব্যবসাবাণিজ্য চলছিলো বেশ কয়েক শো বছর ধরে। প্রথম প্রথম এ লেনদেন হতো তুই সমান-সমান দেশের মধ্যে। ইতিমধ্যে কিন্তু ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের সূচনা হয়। কিন্তু এশিয়ার অন্য সব দেশের মতো ভারতবর্ষে তখন চালু ছিলো এক মান্ধাতার আমলের সেকেলে ব্যবস্থা। তাই এই তুর্বলতার সুযোগে আর নিজেদের কিছুটা উন্নত সমাজব্যবস্থার জোরে ইউরোপের দেশগুলি এ দেশের ওপর জুলুম-জবরদস্তি ও বাণিজ্যের অছিলায় বাটপাড়ি চালাতে থাকে। এই লুটের বখরা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি। এসবের মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক ইংরেজ সওদাগরি প্রতিষ্ঠানই ক্রমে এ দেশের মালিক হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আগেই দেখেছি এখানকার লুটের কড়িতেই সেদিন অনেকখানি গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডের কলকারখানা। এই সব কারখানায় যে রাশি রাশি মাল তৈরি হতে লাগলো তার জন্যে আবার দরকার পড়লো ভারতের মতো মস্তো বাজার। অথচ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিলো এখানকার বাজারের ওপর। বিলেতের কলমালিকরা তাই খর্ব করতে চাইলো সে কর্তৃত্ব। ইংল্যাণ্ডে ক্রমেই যে তাদের প্রতিপত্তি বাড়ছিলো তা আমরা দেখেছি। এও দেখেছি যে ইংল্যাণ্ডে ১৮৩২ সালের ভোটাধিকার সংস্কার আইনের ফলে দেশশাসনের রাশ অনেকখানি এদেরই হাতে এসে পড়ে। তাই শেষপর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার খাটো করতে করতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতশাসনের ভার তাদের হাত থেকে ইংল্যাণ্ডের রানী নিজের হাত তুলে নেন। ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়ায় পুরোদস্তুর গোলাম দেশ।

মোটের ওপর উনিশ-বিশ মাত্রায় এই ব্যাপারই ঘটে চীন-ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্য সব দেশেও।

ইংরেজরা এ দেশ জয় করার আগে এখানে যে সমাজব্যবস্থা ছিলো তার চেহারাটা কেমন? ইংরেজদের ছোঁয়াচেই বা তা কী রকম দাঁড়ালো?

বহু সাম্রাজ্যের উঠতিপড়তি, যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও বহুদিন ধরে এশিয়ায় সমাজ-ব্যবস্থা মোটের ওপর একই ধরনের থেকে গিয়েছিলো। এর গোড়ায় ছিলো একেবারে সেকেলে ধরনের কৃষি ও কুটিরশিল্পের মিলনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য গ্রাম। গ্রামবাসীদের খাওয়াপরার জিনিসপত্র গ্রামেই তৈরি হতো, বাইরের সঙ্গে লেনদেন তাই খুব অল্পই ঘটতো। প্রত্যেকের কাজকর্ম নির্দিষ্ট ছিলো বহুদিন ধরে চালু বিধিনিষেধের দ্বারা।

ইংরেজের সংস্পর্শে এসে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে।

জুলুম, জবরদস্তি, লুটপাট তো ছিলোই ; তার চেয়েও এ দিক দিয়ে মারাত্মক হলো বিলিতি মালের আমদানি। কেমন করে এ দেশের জগদ্বিখ্যাত মসলিন-শিল্প উঠে গেলো আর ঠিক সেই পরিমাণে ভারতবর্ষ ছেয়ে গেলো বিলিতি কাপড়ের স্রোতে, সে কাহিনী তো তোমরা জানোই। এমন ঘটলো দু দেশের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্যের ফলে নয়—মালিকদেশ তার রাজনৈতিক আধিপত্য খাটিয়ে গোলাম দেশের ওপরে এক অসমান লেনদেন চালাতে পারলো বলেই। সে যাই হোক, এর ফল কী দাঁড়িয়েছিলো তাও তোমরা জানো। কোটি কোটি কৃষক ও কারিগর সর্বস্বান্ত হয়েছিলো। শুধু তাই নয়। দুর্ভিক্ষে, অনাহারে পথে পথে মরেছিলো এ দেশের অসংখ্য মানুষ।

এ কথা অবিশ্যি ঠিক যে পুরোনো গ্রাম্য সমাজ জাতিভেদ, গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন ছিলো। তার ওপরে স্বেচ্ছাচারী রাজাবাদশা-সুবেদার-গ্রাম্য মাতব্বরদের খামখেয়াল ও শোষণে অতিষ্ঠ ছিলো দেশবাসী। এও ঠিক যে এই সনাতন জঞ্জাল না হটিয়ে সম্ভব ছিলো না দেশের অগ্রগতি।

কিন্তু সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে ইংরেজরা আমাদের উন্নতিবিধানের জন্যে তো আর এ দেশে আসেনি। তারা এসেছিলো লুটের নেশায়, মুনাফার গন্ধে গন্ধে। নিজেদের দেশে তারা একদিন সেকেলে জঞ্জাল হটিয়ে দেশের ধনতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলো। এখানেও বনেদি সমাজের ভিত টলমল করে উঠলো তাদের দাপটে। কিন্তু পুরোনোর জায়গায় নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এ দেশে নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ খাড়া করা

নিশ্চয়ই তাদের স্বার্থের বিরোধী ছিলো। তাই পশ্চিমের সংস্পর্শে এ দেশের সমাজে ভাঙলো অনেক, কিন্তু তার জায়গায় গড়লো না উন্নততর নতুন। বিদেশী বাহনের পরে ভর করে আসায় এ দেশে গড়ে উঠলো না ধনতন্ত্রের মজবুত ইমারত।

তবু ইংরেজরা যখন বনেদী ব্যবস্থাকে তচনচ করলো বা নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে এ দেশে রেল-টেলিগ্রাফ বা সামান্য কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করলো তখন নিজেদের অজানতে তারা এ দেশের ভাবী উন্নতির পথ নিশ্চয়ই খানিকটা পরিষ্কার করে দিলো—কিছুটা মালমশলাও জোগালো ভাবী উন্নতির।

কিন্তু এ কথাটি পরিষ্কার বোঝা দরকার যে সে উন্নতি বিদেশীর কৃপায় ঘটবে না—ঘটাতে হবে এ দেশের মানুষকেই।

এশিয়ার মানুষ কোনোদিনই মাথা পেতে মেনে নেয়নি বিদেশীর অত্যাচার। আবার এই ভারতবর্ষের দিকেই তাকাও। সন্ন্যাসী, ফকির, পিণ্ডারী, কোল, সাঁওতাল, মোপলা, পাইক, চুয়াড়, ফৈরাজী, ওয়াহবি, নীল, মারাঠি,—আঠারো-উনিশ শতক জুড়ে এই রকম ক্রমাগত ঘটেছে একটার পর একটা বিদ্রোহ। সর্বস্বখোয়ানো কৃষক ও কারিগরেরা দেশের ছোটোবড়ো এলাকা জুড়ে এই সব বিদ্রোহ চালায়। এরই পাশাপাশি ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেও দেখা যায় বিদ্রোহের চেষ্টা।

১৮৫৭ সালের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের কথা তোমরা জানো। প্রায় সারা দেশকেই আলোড়িত করে ঐ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা প্রায় এক লক্ষ বর্গ-মাইল জায়গায় তাদের প্রভুত্ব

বিস্তার করে। অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের মতো কোনো কোনো অঞ্চলে সমস্ত গ্রামবাসী যোগ দেয় সিপাহীদের সঙ্গে। সিপাহীবিদ্রোহ সেখানে পরিণত হয় গণবিদ্রোহে।

বিদ্রোহী সিপাহীরা অধিকাংশই ছিলো কৃষক, কারিগর বা গ্রামের গরিব বাসিন্দা। এদের অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছিলো ইংরেজশাসনে। এর ওপরে সায়েব অফিসারদের দুর্ব্যবহার বারুদে আগুন জোগায়। ক্ষিপ্ত সিপাহীরা অনেক সময়ে নিজেদের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে সংগ্রাম চালায়। তবে বিদ্রোহের লক্ষ্য ও পথ সম্পর্কে এদের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিলো না, তখনকার সময়ে থাকা সম্ভবও ছিলো না। অন্যদিকে ঝাঁসির রানী, নানা সাহেব, তাঁতিয়াতোপি, অযোধ্যার নবাবের মতো যে সব বনেদীবংশের বড়োলোকেরা বিদেশীদের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে বা অপমানিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার—দেশে উন্নততর সমাজ পত্তন নয়। অনেক সময়েই বিদ্রোহ পরিচালনার ভার এঁদের ওপরেই এসে পড়ে। এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও সিপাহী বিদ্রোহের মস্ত গৌরব এই যে এতে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ সিপাহী বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একযোগে অস্ত্র ধরেছিলো।

তবু উন্নততর সমাজব্যবস্থার বাহন ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করে। আর তার পর প্রতিহিংসার নামে যে নৃশংসতা চালায় ভারতবাসীর পক্ষে কোনোক্রমেই তা ভোলা সম্ভব নয়।

মোটের ওপর এই ব্যাপারই ঘটেছিলো এশিয়া বা আফ্রিকার

সব দেশেই। একমাত্র জাপান ঘটনাচক্রে পরাধীনতার হাত থেকে বেঁচে যায় যদিও সেখানেও মার্কিনরা চেষ্টা করেছিলো নাক ঢোকাতে। তবু পশ্চিমের ছোঁয়াচে জাপানী সমাজেও রদবদলের লক্ষণ দেখা দেয়। ১৮৬৭ সালে দেশশাসনের ক্ষেত্রে সেকেলে বনেদীবংশের প্রভাব এরই ফলে অনেকটা খাটো করা হয়। দেশে দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে আধুনিক কলকারখানা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জাপান রূপান্তরিত হয় এক ধনতান্ত্রিক দেশে। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে তার বনিয়াদ অনেকটাই রয়ে যায় সেকেলে ধরনের।

॥ ধনতন্ত্রের নতুন পর্ব ॥

ধনতান্ত্রিক সমাজ পত্তনের ফলে দেশ জুড়ে ছোটোবড়ো বহু কলমালিক বা পুঁজিপতির উদ্ভব হয়। বাজারের দখল নিয়ে, অর্থাৎ বাজারে কে বেশি মাল বেচবে এই নিয়ে, এদের মধ্যে অবিশ্রাম রেশারেশি চলতে থাকে। বড়োর দাপটে ছোটো কারবারকে পাততাড়িও গুটোতে হতো কখনো কখনো। যতো দিন যেতে থাকলো ক্রমশই এ ব্যাপার বেশি বেশি করে ঘটতে লাগলো। অসংখ্য খুদে চুনোপুঁটিদের গিলে কয়েকটিমাত্র বড়ো বড়ো রাঘববোয়াল ফুলে ফেঁপে উঠলো। প্রতিযোগিতা উঠে গিয়ে বাজারের ওপরে এদের দখল হয়ে দাঁড়ালো একচেটিয়া। ট্রাষ্ট, কার্টেল, সিণ্ডিকেট হরেক রকম নামের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে সব থেকে প্রভাবশালী হয়ে উঠলো।

আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করা গেলো। কলকারখানার

মালিকদের টাকাকড়ি যেমন একদিকে ব্যাঙ্কে জমা পড়তো তেমনই অনেক সময় আবার ব্যবসায় বেশি পুঁজি লাগানোর জন্যে ঐ মালিকদের ব্যাঙ্কেরই শরণ নিতে হতো। শিল্পব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে মুনাফায় ভাগ বসানোও ব্যাঙ্কের পক্ষে একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ ক্রমশই কলমালিকদের টাকা আর ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি মিলেমিশে যেতে লাগলো। এর ফলে সমাজে নতুন ধরনের ভীষণ জোরালো শক্তির উদ্ভব হলো। তার নাম ফিন্যান্স পুঁজি। এর মালিকেরা আসলে ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা—দুইয়েরই কর্তা হয়ে দাঁড়ালো।

তারপর আবার ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিরা দেখলো যে নিজের দেশে পুঁজি খাটিয়ে যে হারে মুনাফা কামানো যায় পরাধীন দেশে তার চেয়ে ঢের বেশি মেলে। কারণ সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য বেশ অবাধে খাটানো যায়। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনকে গোড়ার থেকেই দমিয়ে রাখার ফলে শ্রমিকও পাওয়া যায় অনেক সস্তায়। শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে আগে পরাধীন দেশগুলিতে শুধু মালপত্রই চালান যেতো। এখন বাড়তি মুনাফার টানে তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পুঁজি চালানও।

এর আগে যে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা হয়েছে তারাও মুনাফার লোভে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চাইলো। কিন্তু এমন ধরনের প্রতিষ্ঠান সব বড়ো বড়ো ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলিতেই আছে। তাই গোটা দুনিয়ার বাজার কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দখল করা সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত এদের

মধ্যে আপোসে নিজ নিজ প্রভাবাধীন এলাকা হিসেবে ভাগ হয়ে গেলো সারা দুনিয়া।

কিন্তু সব সময়েই এ সব ব্যাপার আপোসে নির্বিঘ্নে ঘটলো না। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে পৃথিবীর বাজার দখলের জন্যে রেশারেশি থাকলেও গোড়ায় গোড়ায় অন্যকে বেদখলের চেষ্টা না করেও নতুন নতুন বাজার হাত করার সুযোগ ছিলো। যতো দিন যেতে লাগলো দেখা গেলো গোটা পৃথিবীটা ভাগবাঁটরা হয়ে গেছে এই সব শক্তিগুলির মধ্যে। তখন কিন্তু অন্যের ভাগ না কেড়ে নিয়ে আর নিজের ভাগ বাড়াবার কোনো উপায় রইলো না। অর্থাৎ বাজার দখলের জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠলো ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে তীব্র স্বার্থের সংঘাত ও যুদ্ধ।

ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে ক্রমশই এই সব লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগলো। সূচনা হলো ধনতন্ত্রের নতুন পর্বের। তার নাম ইম্পিরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ভয়ঙ্কর। কতো ভয়ঙ্কর তা হাড়ে হাড়ে জানে এশিয়া-আফ্রিকার মানুষ, এমন কি ইউরোপ-আমেরিকারও সাধারণ মানুষ। কারণ এদের সবাইকে শুষেই তার জীবনধারণ। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর চেহারা সত্ত্বেও আসলে সাম্রাজ্যবাদ মোটেই ধনতন্ত্রের সাম্যের পরিচয় দেয় না। বরঞ্চ এ কথাই প্রমাণ করে যে সে এমন বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে যে বেপরোয়া না হয়ে তার উপায় নেই। মরণদশা না ধরলে কি আর এমন কাণ্ড হয়।

মরণদশার লক্ষণগুলো স্পষ্ট বোঝা যায়। বুড়ো মানুষের

দেহকে যেমন নানান রোগ চারিদিক থেকে চেপে ধরে সাম্রাজ্যবাদেরও ঠিক তাই। ধনতন্ত্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধনিক আর শ্রমিকের লড়াই শুরু হয়েছিলো তা তো তোমরা দেখেছো। ক্রমেই সে লড়াই বেড়ে বেড়ে চরমে ওঠে। মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিচালনায় ছুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন 'প্রথম আন্তর্জাতিক' বারো বছর কাজ চালায়। এমন কি ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশের শ্রমিকেরা কিছুদিনের জন্যে দেশশাসনের গদি পর্যন্ত দখল করে নতুন এক ধরনের শ্রমিক-রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে তার পরিচয় 'প্যারিস কমিউন' নামে। সে রাষ্ট্র টেকেনি। ৭২ দিন পরে ধনিকদের দল বিদেশী শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে নিঃশেষ করে। কিন্তু ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্ব তাতে মেটেনি এতোটুকুও। সাম্রাজ্যবাদী পর্বে বরঞ্চ সে বিরোধ ক্রমেই আরো ব্যাপক, আরো তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের অন্তিম দশা, তেমনই অন্য দিকে আবার তা শ্রমিকবিপ্লবের সূচনাও বটে।

আরো এক কথা। এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশের ধনিক সরকারদের সংঘাতও শুরু হয় ধনতন্ত্রের গোড়ার আমলেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লোভ উদ্দাম হয়ে যখন সারা পৃথিবীকেই গ্রাস করে তখন একদিকে যেমন সে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে, তেমনই আবার শোষণের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা ঢের বেশি তীব্রও হয়ে উঠলো আগের থেকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে পরাধীন দেশগুলির বিরোধ

তাই ঘনিয়ে উঠতে লাগলো দিনকে দিন।

সাম্রাজ্যবাদী পর্বের আরো এক উপসর্গ হলো ছুনিয়ার বাজারের দখলদারি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেই সংগ্রাম— কখনো কখনো বা পুরোদস্তুর বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালে এক তুচ্ছ ছুতোয় এমনই করেই শুরু হয়েছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সে লড়াই যে কী ভীষণ, কতো কোটি কোটি মানুষ যে তাতে সর্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত হারায় তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর মানুষের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ তাই হচ্ছে একটা চরম বিভীষিকা!

॥ নতুনের পত্তন ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলে প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে। নানা মত ও নেতার পক্ষে এ যুদ্ধ হলো এক অগ্নি-পরীক্ষা। কারণ মরণ-বাঁচনের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষের আসল রূপটা সহজেই ধরা পড়ে।

কিছু দিন থেকেই নানান দেশের শ্রমিকদের কাছে এ কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো যে সাম্রাজ্যবাদীদের এই বাজারের বখরাদারির লড়াইয়ে তাদের কোনো স্বার্থ তো নেইই বরঞ্চ তাদের ক্ষতি ষোলো আনাই। মার্কসের মৃত্যুর পর ১৮৮৯ সালে পৃথিবীর শ্রমিকদের যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (সংক্ষেপে এর নাম 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তার মঞ্চ থেকেও প্রায় বছর বছর ঘোষিত হতো শ্রমিকদের যুদ্ধবিরোধী সংকল্প।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এ সব ঘোষণার দৌড়

কতোখানি তা যাচাইয়ের সময় এলো। দেখা গেলো জার্মান শ্রমিক পার্টির মতো বড়ো বড়ো শ্রমিক দলের নেতারা অনায়াসে সমস্ত যুদ্ধবিরোধিতার সংকল্প বিসর্জন দিয়ে ভিড়ে পড়লেন নিজের নিজের দেশের ধনিক সরকারের পিছনে।—'মাতৃভূমি রক্ষার' ধূয়ো তুলে তাঁরা দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণকে খেপাতে লাগলেন অন্য দেশের ভায়েদের রক্তে হাত রাঙাতে।

একমাত্র রাশিয়ার শ্রমিক দল—বলশেভিক পার্টি—সেদিন তাদের নির্ভীক নেতা লেনিনের নেতৃত্বে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবিচল রইলো। তারা বললো এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এতে শ্রমিকের কোনো স্বার্থ নেই। তবু যুদ্ধ যখন লেগেছেই তখন শ্রমিকদের কাজ হবে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করে বিপ্লবের পথ তৈরি করা। কারণ লেনিন দেখিয়েছিলেন ধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী পর্বে অন্তর্বিরোধের ফলে মহাযুদ্ধ যেমন অনিবার্য তেমনই অনিবার্য শ্রমিক বিপ্লবও।

লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকেরা জার সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করতে থাকে। এমন কি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা জোর প্রচার চালায়—বিপ্লব ছাড়া এ দুর্গতি ও রক্তপাতের শেষ নেই। একদিকে তখন যুদ্ধে, মহামারীতে দেশের হাজার হাজার লোক মরছে প্রতিদিনই—দেশবাসীর দুরবস্থাও উঠেছে চরমে। আর ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধের জোগান দিয়ে ধনিকেরা মোটা মুনাফা লুঠছে দুহাতে। একদিকে জার্মানদের কাছে জারের সৈন্যদের পরাজয়ের পর পরাজয়, আর এক দিকে খবর

জানা গেলো জারের মন্ত্রীদের মধ্যেই আছে শত্রুর গুপ্তচর। সব দিক থেকেই অবস্থা দেখতে দেখতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। শ্রমিক, কৃষক, সিপাহী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠলো বিপ্লবী আন্দোলন।

১৯১৭ সালের শুরুতে শোনা গেলো সাধারণ ধর্মঘটের ডাক। সভা ও মিছিল থেকে হাঁক উঠলো 'জার নিপাত যাক...বন্ধ হোক খুনোখুনি'। দেখতে দেখতে রাজপথে শুরু হলো সশস্ত্র লড়াই। মজুরদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সিপাহীরা পর্যন্ত বন্দুক ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। ১২ই মার্চ গদিচ্যুত হলো প্রবলপরাক্রম স্বেচ্ছাচারী জার।

বিপ্লবের আগুনের মধ্যে সেদিন উদ্ভূত হলো নতুন এক ধরনের রাষ্ট্রশক্তির অঙ্কুর—সোবিয়েত। ও কথাটার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'সমিতি'। আসলে সোবিয়েত হচ্ছে একদিকে সশস্ত্র লড়াইয়ের হাতিয়ার আর একদিকে লড়াই চালিয়ে ক্ষমতা দখলের পর সোবিয়েত হবে নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তির ঘাঁটি।

গোড়ায় গোড়ায় এই সোবিয়েতগুলিতে কিন্তু বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মেনশেভিকদের মতো নানা সুবিধাবাদীরাই ছিলো এদের মধ্যে দলে ভারি। কারণ লেনিন-স্তালিনের মতো বলশেভিক নেতারা যখন নির্বাসনে তখন ঐ সব দলের নেতারা বেশ নির্বিঘ্নে পথে ঘাটে তাঁদের প্রচার চালাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, মেনশেভিকদের মতো সুবিধাবাদী দল ধনিকদের 'ক্যাডেট' পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেরেনস্কির নেতৃত্বে এক 'অস্থায়ী সরকারও' খাড়া করে। অর্থাৎ

একদিকে সোবিয়েত আর একদিকে এই সরকার—পাশাপাশি উদ্ভব হয় দুই রাষ্ট্রের।

নির্বাসন থেকে ফিরে এই দোটানা থেকে উদ্ধারের পথ দেখালেন লেনিন। তিনি বললেন, যে বিপ্লব ঘটে গেছে তার রূপ ধনতান্ত্রিক। এবারে একমাত্র কাজ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি। তার জন্যে প্রথমেই দরকার সোবিয়েতের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে নেওয়া। আর সে কাজ করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালিয়ে, সোবিয়েতগুলিতে যে সব সুবিধাবাদীরা বেশি আসন দখল করে রেখেছে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে।

দেশের মানুষের দুর্গতি কিন্তু ইতিমধ্যে কিছুই কমেনি। রক্তাক্ত যুদ্ধ যেমন আগে চলছিলো অস্থায়ী সরকারও ঠিক তেমনই তা চালাতে লাগলো। তা ছাড়া ঐ সরকারের কাজকর্ম জনসাধারণের কাছে ক্রমেই বেশ সন্দেহজনক বোধ হচ্ছিলো। এ সবের দরুন বলশেভিকেরা যখন একটানা প্রচার শুরু করলো তখন সোবিয়েতগুলিতে ক্রমে তাদের শক্তি বেড়ে উঠতে লাগলো।

বুঝতেই পারো 'অস্থায়ী সরকার' মোটেই এতে খুশি হয়নি। জুলাই মাসে তাই গুলি চললো শ্রমিক মিছিলের ওপর—গ্রেপ্তারি পরোয়ানার চোটে ফের আবার গা-ঢাকা দিতে হলো লেনিনকে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্কি বিপ্লবকে নির্মূল করার জন্যে কর্নিলভ নামে এক জারতন্ত্রী সেনাপতির সঙ্গে চক্রান্ত চালালো সামরিক অভ্যুত্থানের সাহায্যে হঠাৎ ক্ষমতা দখলের। এই সর্বনাশ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যে বলশেভিকেরা যখন আবেদন

জানালো তখন দেখা গেলো দেশবাসীর মুখ নিশ্চিতভাবেই ফিরেছে তাদের দিকে। হাজার হাজার মানুষের প্রতিরোধের জোয়ারে কর্নিলভ চক্রান্ত তো ব্যর্থ হলোই সোবিয়েতগুলিতেও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো বলশেভিকদের। মজুরেরা তো বটেই, গরিব কৃষকরাও এবার দলে দলে যোগ দিলো বলশেভিকদের সঙ্গে। কারণ তারা বুঝলো যে জমিদার-সেনাপতিদের জোট যদি একবার বলশেভিক ও সোবিয়েতগুলিকে ধ্বংস করতে পারে তা হলে ব্যর্থ হবে তাদের জমি পাওয়ার আকুল কামনা।

কাজেই 'সোবিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই' চারিদিকেই শোনা যেতে লাগলো এই বিপ্লবী ধ্বনি। ৬ই নভেম্বর থেকে শুরু হলো কেরেনস্কি সরকারের সঙ্গে বলশেভিকদের খোলাখুলি লড়াই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বলশেভিক নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী ফৌজ শত্রুর বড়ো বড়ো ঘাঁটি দখল করে নেয়—জারের ইতিহাসখ্যাত 'উইনটার প্যালেস' অধিকার করে গ্রেপ্তার করে অস্থায়ী মন্ত্রীদের। সেই রাতেই সোবিয়েত সম্মেলন থেকে ঘোষণা জানানো হয়—সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা এখন সোবিয়েতের হাতে। প্রতিষ্ঠা হয় সোবিয়েত রাষ্ট্রশক্তির।

৮ই নভেম্বর সোবিয়েত সম্মেলন থেকে প্রকাশ করা হয় আরো দুটি জগদ্বিখ্যাত ঘোষণা। প্রথমটিতে সমস্ত জাতির কাছে আবেদন জানানো হয় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার। অন্যটিতে জমির মালিকানা-স্বত্ব বিনা ক্ষতিপূরণে বিলোপ করে জার, গির্জা ও জমিদারের সমস্ত জমি অর্থাৎ ৪০ কোটি একর জমি বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয় কৃষকদের হাতে।

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রমিক-রাষ্ট্র মানুষকে দেখায় শান্তির পথ আর অসংখ্য দেশবাসীকে জোগায় মানুষের মতো বাঁচার সঙ্গতি।

এর আগে নানা দেশে বহুদিন ধরেই শ্রমিকেরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা রকমের সংগ্রাম করেছে, কখনো বা 'প্যারিস কমিউন'-এর মতো চেষ্টা করেছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের। তাদের সংগ্রাম নিশ্চয়ই সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে, সঠিক কৌশলের নিশানা দিয়েছে অন্য দেশের, অন্যদিনের শ্রমিককে। তবু কিন্তু তখনকার মতো ব্যর্থ হয়েছে তাদের নির্ভীক সংগ্রাম।

নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ার প্রথম সার্থক শ্রমিকবিপ্লব। তার সার্থকতা সম্ভব হলো তবে কী করে?

কতগুলো বাইরেকার সুযোগ অবশ্যই ছিলো। যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা মরণপণ যুদ্ধে জড়িত থাকায় বিপ্লব দমনের জন্যে তাদের পুরো শক্তি লাগাতে পারেনি যদিও বেশ কিছুটা চেষ্টা তারা নিশ্চই করেছিলো। তা ছাড়া সাড়ে চার বছর ধরে ক্রমাগত রক্তপাতের দরুন সব দেশের মানুষই যেমন একদিকে ব্যাকুল হয়েছিলো শান্তির জন্যে তেমনই আবার তারা এও বুঝতে পারছিলো যে সমাজব্যবস্থা না বদলালে এ দুর্গতির শেষ নেই। তাই সোবিয়েত রাশিয়ার শান্তির ডাক, তার বিপ্লবী রূপান্তরকে তার সমর্থন করেছিলো যথাসাধ্য।

কিন্তু রুশ বিপ্লবের সার্থকতার মূল কারণের সন্ধান মিলবে রাশিয়ার ভিতরেই। সে দিকে নজর ফেরালে দেখা যাবে শুধু যে দেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিক এ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলো

তাই নয়, কৃষক ও সিপাহীরাও জমি পাবার, রক্তপাত বন্ধ করার একমাত্র ধ্রুব পথ হিসেবেই একে গ্রহণ করেছিলো। তা ছাড়া একদিকে যেমন বিপ্লব পরিচালনা করেছিলো বলশেভিক পার্টির মতো অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ পার্টি, তেমনই আবার অন্য পক্ষে ধনিকেরা শ্রেণী হিসেবে ছিলো খুবই দুর্বল, জমিদারেরা জর্জরিত হয়েছিলো কৃষক-বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে আর যুদ্ধের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গিয়েছিলো মেনশেভিকদের মতো মেকি বিপ্লবীদের দৌড়। তা ছাড়া রাশিয়ার মতো বিশাল দেশে বিপ্লবী যোদ্ধাদের দরকার হলে পিছু হটার, সুযোগমতো এগিয়ে ঘা মারার, দম নেবার বা শক্তি সংগ্রহের যথেষ্ট সুবিধে ছিলো। আর সুযোগ ছিলো লড়াই চালানোর মতো খাদ্য, কাঁচামাল বা রসদ সরবরাহের।

ঘরেবাইরে এই সব সুযোগসুবিধাকে কৌশলে কাজে লাগাতে পারার দরুনই সেদিন সার্থক হয় নভেম্বর বিপ্লব।

কিন্তু রুশ বিপ্লবের ফলাফল কি শুধু ঐ দেশের সীমানার ভিতরেই আটক রইলো? তা যে থাকেনি পৃথিবীর সমস্ত ধনিক সরকারগুলি যে-ভাবে নানাকৌশলে অথচ একটানা সোবিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুতা চালিয়ে এসেছে তার থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এতোদিন পরে এই প্রথম একটা দেশে শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তার বিপ্লবী দৃষ্টান্ত অবিশ্রাম প্রেরণা জোগাচ্ছে অন্যদেশের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে জর্জর পরাধীন দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখলে চীন, পারস্য তুর্কির মতো যে সব দেশের ওপরে জারতন্ত্রী রাশিয়া জুলুম-জবরদস্তি

চালিয়ে এসেছে বছরের পর বছর, শ্রমিকরাষ্ট্র কিভাবে তার অবসান ঘটিয়েছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, কিভাবে বিপুল জার সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জাতিগুলি নতুন রাষ্ট্রে প্রবল রুশ-জাতির সঙ্গে সমানে সমানে বন্ধুত্বের মর্যাদা লাভ করেছে, স্বেচ্ছায় তারা মিলিত হয়েছে সোবিয়েত ইউনিয়ন নামে মহাজাতি-সংঘের মধ্যে। এ সবের দরুন নভেম্বর বিপ্লবের ফলে এমন একটা স্থায়ী, মজবুত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার চারিদিকে মালিকদেশের শ্রমিক ও পরাধীন দেশের সাধারণ মানুষ একজোট হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আর এ বিপ্লব শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, চিন্তাজগতেও ঘটিয়েছে এক বিপুল রূপান্তর। ত্বনিয়ার শ্রমিক ও জনসাধারণের মনে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের বিপ্লবী চিন্তার আসর।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলতে চলতেই রুশ দেশে বিপ্লব হয়। কিন্তু বপ্লবী হাওয়া সেদিন বইতে থাকে সারা পৃথিবীতেই। যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত ত্বর্গতি তাদের মনকে যুদ্ধবিমুখ করে তুলেছিলো। এমন সময় এলো সোবিয়েতের বিপ্লবী দৃষ্টান্ত। তাই জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইটালি—সর্বত্রই দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবী মনোভাব। কিন্তু পথের নিশানা স্পষ্ট না জানা থাকায়, পুরোনো ধরনের শ্রমিক নেতাদের চরম বিশ্বাস-ঘাতকতায় ব্যর্থ হয় ঐ প্রচেষ্টা। তা ছাড়া ১৯১৮ সালে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ায় ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্সের মতো দেশের সাম্রাজ্যবাদী সরকার বিপ্লব দমনের জন্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগও

করতে পারে। এ সব মিলিয়ে সেদিন বানচাল হয়ে যায় ইউরোপের বিপ্লব।

শুধু ইউরোপেই নয়, এশিয়ার পরাধীন দেশেও এ সময়ে বিপুল আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে চীন দেশে শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক প্রবল আন্দোলন। এই আন্দোলনে ছাত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি লড়াই চালায় চীনের শ্রমিকেরা। এ সবের ভেতর থেকেই ১৯২১ সালে উদ্ভূত হয় ইতিহাসবিখ্যাত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি। এর কিছু আগে থেকেই দেশপ্রেমিক নেতা ডাঃ সুন ইয়াত-সেন-এর নেতৃত্বে তখনকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান কুওমিনটাং চেষ্টা করছিলো চীনকে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক এক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার। এ প্রতিষ্ঠানে ধনিক ও মধ্যবিত্তেরাই ছিলো দলে ভারি। কাজেই ১৯২৪ সালে কুওমিনটাং ও কমিউনিষ্ট পার্টি যখন জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি—এই তিন মূল নীতি আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোবিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিতালি, জাতীয় ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী ও কৃষক-মজুরদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা—এই তিন কর্মনীতির ভিত্তিতে একজোট হলো তখন সত্যিই প্রবল হয়ে উঠলো জাতীয় আন্দোলন। এ আন্দোলনের প্রচণ্ড জোয়ারের মুখে ভেসে যেতে থাকে উত্তর চীনের সেকেলে সমর-নায়কদের প্রতিরোধ। এতে কিন্তু ক্রমেই ঘাবড়াতে থাকে চীনের ধনিক ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বিদের দল। তারা তখন তলে তলে চক্রান্ত আঁটতে থাকে

এই মিলিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক নামে এক বিশ্বাসঘাতক নেতা বেইমানি করে জাতীয় ঐক্যকে তচনচ করে দেয়—গুলি চালিয়ে হত্যা করে হাজার হাজার বিপ্লবীকে। চীন আগের মতোই আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশেও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই সময়টায় জোরালো আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। শ্রমিকেরা শুরু করে ধর্মঘট, তাদের নানান দাবি আদায়ের জন্যে গড়তে থাকে ট্রেড ইউনিয়ন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা তো তোমরা জানোই। ব্রিটিশ বীরপুরুষেরা সেখানে নিরস্ত্র জনসভার ওপরে গুলি চালিয়ে খুনজখম করে তিন হাজার নারী, শিশু ও পুরুষকে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এতোদিন সম্পূর্ণ আইনসম্মত পথে কিছু কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলো। এ সময়ে দেশবাসীর বিক্ষোভ তাকেও সরকার-বিরোধী গণ-আন্দোলনে নামায়। সে আন্দোলনের রূপ ছিলো স্কুল-কলেজ-কাছারি ত্যাগ বা বিলিতি জিনিস বর্জনের মতো অসহযোগজ্ঞাপক কাজকর্মের। গণ-আন্দোলন কিন্তু প্রবল হয়ে উঠে কংগ্রেস-নির্ধারিত সীমানা পেরোবার উপক্রম করে। গান্ধীজী তখন রাশ টানেন আন্দোলনের। ইংরেজ-রাও আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেখে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলো। তারাও তাই মিটমাটের পথ খুঁজছিলো। এই অবস্থায় সামান্য কিছুটা শাসনসংস্কারের ভিত্তিতে উভয়পক্ষে বোঝাপড়া হয়ে যায়। অসহযোগ ছেড়ে কংগ্রেস ঢুকে পড়ে আইনসভায়।

তুর্কিতেও মুস্তাফা কেমাল পাশা-র নেতৃত্বে জেগে ওঠে প্রবল জাতীয় আন্দোলন। যুদ্ধে তুর্কি হেরে যাওয়ার পর সাম্রাজ্য-

বাদীরা তার সাম্রাজ্য তো ভাগবাঁটরা করে নেয়ই, এমনকি স্বাধীন দেশ হিসেবে তার টিঁকে থাকাই প্রায় অসম্ভব করে তোলে। ঠিক এই সময়ে মুস্তাফা কেমালের আন্দোলন ব্যর্থ করে দেয় সে চক্রান্ত। তুর্কি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

॥ ধনতন্ত্রের একটানা সংকট ॥

ধনতন্ত্রের অবস্থা যে বেশ নাজেহাল হয়ে উঠেছে এ সব থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এমনও নয় এ একটা সাময়িক ব্যাপার— ফের আবার ধনতন্ত্র পুরোপুরি ঘর সামলে জোরদার হয়ে উঠবে। কারণ সারা পৃথিবী তো এর মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে সাম্রাজ্য-বাদীদের মধ্যে। তাই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে অন্যের জমিদারি কেড়ে না নিলে কোনো সাম্রাজ্যবাদী তার মাল কাটাবার বাজার বাড়াতে পারে না। অথচ মালপত্র বানাবার শক্তি তার এতো বেশি হয়ে উঠেছে যে বাজার না বাড়াতে পারলেও তার সর্বনাশ।

যুদ্ধের ফলে এই বেকায়দা অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। শুধু যে সাধারণ মানুষের দুর্গতি বেড়ে ওঠার ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠলো তাই নয়। যুদ্ধ চালানোর জন্যে পরাধীন দেশের ওপর তাদের শোষণ ও জুলুম বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার মানুষও রুখে উঠলো সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে। তার ওপরে পৃথিবীর ছ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ গোটা সাম্রাজ্য সমেত রাশিয়া বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় অবস্থা চরমে পৌঁছোলো। ধনতন্ত্র পড়লো একটা এক-

টানা বেসামাল অবস্থার ঘূর্ণিপাকে।

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ থেকে এই বিপাকের হাত থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টাই হয় নি এমন নয়। কিছুদিনের মতো সে চেষ্টা কিছুটা ফলপ্রদও হয়েছিলো। ১৯২২-২৩ সাল নাগাদ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় সব দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকেই দমন বা বানচাল করে দিতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মালপত্র উৎপাদনও আবার বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্যোগী হয়ে গড়ে তোলে এক 'লীগ অফ নেশন্স' বা জাতিসংঘ। এর মারফত তারা সারা দুনিয়াতে তাদের মাতব্বরি চালু রাখার চেষ্টা চালায়। জার্মানির ওপরে ভের্সাই চুক্তি চাপিয়ে দিয়েও তারা অনেকটা গুছিয়ে আনে অবস্থা।

সব থেকে সুবিধে করে নেয় অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একেবারে শেষ দিকে যুদ্ধে নামলেও মোটের ওপর সে ছিলো এ সব হাঙ্গামা থেকে বহু দূরে। তারই সুযোগে যুদ্ধের ক বছরে সে অবাধে তার কলকারখানা বাড়িয়ে তোলে। যুদ্ধের পরেও সে ক্রমাগত মালপত্র উৎপাদন বাড়াতে থাকে আর দু হাতে খয়রাতি কড়ি ছড়িয়ে সারা দুনিয়ায় জাঁকিয়ে তোলে তার মাতব্বরি। ব্রিটেনকে হটিয়ে সে অনায়াসে হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর সব থেকে ধনী দেশ। সব দিক দিয়েই তার শ্রীবৃদ্ধি এমনই চটকদার হয়ে উঠে যে ধনিকমহলে রব উঠলো এ উন্নতির কোনো শেষ নেই, মানুষের দুঃখদারিদ্র্যের অবসান হলো বলে!

এই নিয়ে হৈ-হল্লা যখন চরমে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে ১৯২৯ সালে ঐ মার্কিন মুল্লুকেই দেখা গেলো এক সাংঘাতিক অর্থ নৈতিক

সংকট। মহামারীর মতো ব্যাঙ্কের পর ব্যাঙ্ক, একের পর এক কারখানা লালবাতি জ্বাললো। ব্যাঙ্কে যাদের টাকা জমা ছিলো বা কারখানায় যাদের টাকা খাটতো রাতারাতি তাদের অনেকেই পথে বসলো। বেকার মানুষের সংখ্যা চলে গেলো গুনতির বাইরে। আর মার্কিনদের খয়রাতি টাকায় যে সব দেশ ঘর সামলাবার চেষ্টা করছিলো মহাজনের সর্বনাশে তারাও ডুবলো সর্বনাশের অতলে।

আর সেই রসাতলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো এক ভয়ঙ্কর দানব—ফ্যাসিশম। অবশ্য এর আগেই ১৯২২ সাল নাগাদ এর উদ্ভব হয়েছিলো ইটালিতে। সেখানে তখন প্রায় বিপ্লবের অবস্থা। শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে কারখানা দখল করে বসে আছে অথচ তাদের লক্ষ্য ও পথের স্পষ্ট নিশানা নেই, এক-তারও জোর নেই। তবু ধনতন্ত্রের পক্ষে অবস্থাটা মোটেই সুবিধার ছিলো না। এ হেন গোলমেলে অবস্থার সামাল দেবার জন্যেই ইটালির ধনিকেরা ফ্যাসিশমের জবরদস্ত পন্থার আশ্রয় নেয়। তারা টাকা ছড়িয়ে সমাজের গুণ্ডা, বেপরোয়াদের জড়ো করে ও তাদেরই সাহায্য কায়েম করে খোলাখুলি জুলুম-জবরদস্তির রাজত্ব। এদের নেতা মুসোলিনি গদিতে চড়েই চরম অত্যাচার চালাতে থাকে জনসাধারণের ওপরে, এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দেয় দেশের নিয়মতন্ত্র ও কেড়ে নেয় সাধারণ মানুষের সব রকম গণ-তান্ত্রিক অধিকার।

তবু ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ইটালির স্থান ছিলো পিছনের দিকে। কিন্তু ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কা সামলাবার

জন্যে ফ্যাসিশমের দরকার পড়লো জার্মানির মতো শিল্প-প্রধান দেশেও। সেখানেও শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ধনিকেরা ১৯৩৩ সালে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী পার্টি গড়ে ও দেশে ফ্যাসিষ্ট শাসন কায়েম করে। গদিতে বসেই হিটলার 'কমিউনিষ্টরা শাসন-পরিষদ-ভবনে আগুন দিয়েছে' ধুয়া তুলে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি করে আর হাজার হাজার মজুর, কৃষক, সাধারণ মানুষের ওপরে অকথ্য অত্যাচার চালায়। তবে তার মধ্যেও এক জায়গায় তাকে হার মানতে হয়। তৃতীয় কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের শ্রেষ্ঠ নেতা বিখ্যাত বুলগারিয়ান বিপ্লবী ডিমিট্রভকে যখন শাসন-পরিষদ-ভবনে আগুন দেওয়ার মামলায় জড়ানো হয় তখন আশ্চর্য নির্ভীকতা ও তীক্ষ্ণ যুক্তির জোরে তিনি দেখিয়ে দেন যে কমিউনিষ্টরা নয়, আসলে নাৎসীরাই জ্বালিয়েছে আগুন। সারা-পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত ডিমিট্রভকে সেদিন ছেড়ে দিতে হয়।

ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বকে হঠাৎ দেখলে খুব শক্তিশালী মনে হতে পারে। আসলে কিন্তু তার আবির্ভাব ধনতন্ত্রের একটানা বিপত্তিরই এক ধরনের প্রকাশ। কারণ চরম বেকায়দা অবস্থায় পড়ে মরিয়া হয়েই ধনিকেরা এর আশ্রয় নেয়। তখন আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না গণতন্ত্রের ধার ধারবার। নিজেদের গড়া নিয়মতন্ত্র, পার্লিয়ামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা খতম করে তখনই শুধু তারা পত্তন করে খোলাখুলি গুণ্ডামির। তাই ফ্যাসিশম ধনতন্ত্রের শক্তির পরিচয় নয়, তার মরণদশার বেপরোয়া হাত-পা ছোঁড়াই সামিল।

ইটালি, জার্মানি ছাড়া অন্য কোনো কোনো দেশেও ফ্যাসি-

শমের লক্ষণ দেখা যায়। বিশেষ করে জাপানে তা খুবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এমনকি ফ্রান্সের মতো দেশেও ১৯৩৪ সালে ফ্যাসিষ্টরা ক্ষমতা দখলের জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তবে সেখানকার বিপ্লবী শ্রমিক ও জনসাধারণ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সেদিন ব্যর্থ করে তাদের সেই অপচেষ্টা।

॥ সর্বনাশের অতলে ॥

ফ্যাসিষ্টরা কিন্তু শুধু নিজের দেশের মানুষের ওপরেই অত্যাচার চালিয়ে ক্ষান্ত হলো না। গোড়ার থেকেই তাঁদের ঝোঁক ছিলো ছলেবলে কৌশলে পররাজ্য গ্রাসের দিকে। ১৯৩১ সালে বিনাবাক্যব্যয়ে মাঞ্চুরিয়া ও পরে গোটা উত্তর চীন দখল করে জাপান পথ দেখায়। তারপর ১৯৩৫ সালে মুসোলিনি অধিকার করলো আবিসিনিয়া। ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও ইটালি স্পেনের নব-নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরূদ্ধে সেখানকার হবু ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর জেনারেল ফ্রাঙ্কো-কে অবাধে অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি জুগিয়ে বিদ্রোহে নামালো।

এইখানে আবার আর এক বিপত্তি দেখা দিলো। ফ্যাসিশম-এর জন্মের সময় থেকেই ফ্রান্স, ব্রিটেনের মতো দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তার প্রতি বেশ প্রসন্ন ছিলো। দেশের জনসাধারণের জোরালো বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তারা নানাভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছিলো ফ্যাসিষ্ট জবরদস্তির। ব্রিটেন তো জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান খোলাখুলি সমর্থনই করেছিলো। ১৯৩৫ সালে নাৎসীদের সঙ্গে তার নৌচুক্তিও সম্পন্ন হয়। স্পেনের বেলাতে অবশ্য অতো

সোজাসুজি ফ্যাসিষ্টদের সমর্থন করা সম্ভব ছিলো না কারণ সেদিন স্পেনবাসীর স্বনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদের এই একান্ত অন্যায় হস্তক্ষেপ সারা পৃথিবীর মানুষকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিলো। এমনকি পৃথিবীর প্রায় সবদেশের মহাপ্রাণ সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মী ও জ্ঞানীগুণীরা দলমত-জাতিধর্ম-নির্বিশেষে এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে স্পেনের রণক্ষেত্রে লড়েছিলেন ফ্যাসিশমের বিরুদ্ধে। তাই সাম্রাজ্য-বাদীদের এবার একটু কারসাজি করে ফ্যাসিষ্ট-পোষকতা করতে হলো। তারা স্পেনের গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে ঘোষণা করলো 'কোনো পক্ষেই হস্তক্ষেপ না করার' নীতি। কথাটা শুনতে ন্যায্য মনে হলেও সাম্রাজ্যবাদীদেরই কারসাজিতে এর মধ্যে গোড়াতেই মস্ত গলদ রয়ে গেলো। কারণ দেশের আইন অনুসারে নির্বাচিত পুরোপুরি বৈধ সরকার আর তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী গুণ্ডার দল—এই দুইয়ের প্রতি একই আচরণের মধ্যে ন্যায্যতা কোথায়? কার্যক্ষেত্রে এর ফল হলো মারাত্মক—যে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা কোনোদিনই চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির কিছুমাত্রও তোয়াক্কা রাখেনি তারা অম্লানবদনে ফ্রাঙ্কোকে সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাকড়ি পাঠাতেই থাকলো আর অস্ত্রাভাবে, রসদের অভাবে মারা পড়লো স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার। স্পেনে কায়েম হলো ফ্যাসিষ্ট ফ্রাঙ্কোর রাজত্ব।

এ সব থেকে ফ্যাসিষ্টরা বুঝলো যে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের শাসকেরা সত্যসত্যই তাদের ঠেকাতে চায়না, 'লীগ অফ নেশন্স-ও তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না। সেই ভরসা পেয়ে

জার্মানি, জাপান ও ইটালি তখন একের পর এক ঐ সংগঠনকে বর্জন করলো—তারো খোলাখুলি গুণ্ডামি চালানোর সুবিধের জন্যে। তারপর শুরু হলো একতরফা চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির খেলাপ, আর একটার পর একটা দেশের ওপর হামলা।

এমন সাংঘাতিক অবস্থাতেও কিন্তু সোবিয়েত ইউনিয়ন সেদিন হাল ছাড়েনি। একদিকে যেমন শত্রুর আক্রমণ ঘটে গেলে তার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যে সে আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা অটুট করে তুলছিলো অন্যদিকে তেমনই সে প্রাণপাত চেষ্টা করছিলো যাতে সবাই মিলে ফ্যাসিশমকে রোখা যায় আর যুদ্ধ না বাধে। বারবার সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এই বলে সতর্ক করছিলো যে হিটলার-মুসোলিনি যতোই সাম্যবাদ বা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' বিরুদ্ধে গলাবাজি করুক না কেন আসলে সে ব্রিটেন-ফ্রান্সকেও ছেড়ে কথা কইবে না। ফ্যাসিশমের বর্বর লোভের মুখে কেউই নিরাপদ নয়—সবাই জোট বেঁধে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারলেই প্রত্যেকে নিরাপদ থাকার ভরসা পেতে পারে। লীগ অফ নেশন্স-এর ভিতরেও সোবিয়েত এই চেষ্টাই চালাতে লাগলো।

সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু হিসেবটা ছিলো অন্যরকম। এমন নয় যে তাদের সঙ্গে ফ্যাসিষ্টদের কোনো বিরোধ ছিলো না। কিন্তু বিরোধ সত্ত্বেও তাদের মতলব ছিলো ফ্যাসিষ্টদের তোয়াজ করে যাতে তাদের সোবিয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়। কারণ তা হলে ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাবে। আবার লড়ালড়িতে ফ্যাসিষ্ট বাঘও কিছুটা ঘায়েল হলে তাতেও তো তাদেরই লাভ। তাই

তারা ফ্যাসিশমকে রুখবার জন্যে সোবিয়েত বা 'কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক' বারবার যে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছিলো তাতে কান তো দিলোই না বরঞ্চ ফ্রান্সে যখন কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল পার্টিরা একজোট হয়ে ফ্যাসিষ্টবিরোধী সরকার গড়ে তুললো তখন নানা চক্রান্ত করে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত বানচাল পর্যন্ত করে দিলো।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা চরমে পৌঁছোলো ১৯৩৮ সালে। ইতিমধ্যে হিটলার অষ্ট্রিয়া গ্রাস করে চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে হাত বাড়াচ্ছিলো। এই চূড়ান্ত সর্বনাশের মুখেও সোবিয়েত আবেদন জানালো—আসুন, সবাই মিলে আমরা এ অত্যাচারকে রুখে দিই। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী সরকার ভাবলো—এই তো জার্মানি বেশ সোবিয়েত সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে! তাই ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক শহরে হিটলার, মুসোলিনি, চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের জার্মানি, ইটালি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এই চার প্রধানের ষড়যন্ত্র-সভায় স্থির হলো যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সঁপে দেওয়া হবে নাৎসীদের হাতে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের চালেই ছিলো মারাত্মক ভুল। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসেও স্তালিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই বলে সতর্ক করেন যে ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে খাওয়াবার মতলবে তারা যে ফ্যাসিষ্ট তোয়াজের প্যাঁচ কষছে তাতে উল্টো ফলও ফলতে পারে। ছ মাসের মধ্যে সত্যসত্যই তাই ঘটলো। কারণ ফ্যাসিশমকে রুখবার জন্যে জোট বাঁধার সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ

হলো তখন সোবিয়েত ইউনিয়নকে বাধ্য হয়ে নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাবতে হলো। সে জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করলো কেউ কারো বিরুদ্ধে লড়বে না। অর্থাৎ যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের এতো চেষ্টা তাই বানচাল হয়ে গেলো।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের।

গোড়ার দিকে হিটলার খুব জোর রকম জিততে থাকে। তার প্রধান কারণ, তখন ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবছিলো এখনো হয়তো হিটলার আমাদের সঙ্গে না লড়ে পুব দিকে সোবিয়েতের দিকেই ধাওয়া করবে। তা ছাড়া ১৯৩৭ সালে ফ্যাসিষ্টবিরোধী জোটের সরকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ফ্রান্সের বড়ো বড়ো ধনিকদের সরকার চরম বিশ্বাসঘাতকতার পথ ধরে চলছিলো। দেশের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমানোর ব্যাপারে তাদের জুড়ি মেলা ভার। এমনকি হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তাদের এই ব্যাপারে উৎসাহ এতোটুকু কমলো না। বোঝাই যায় এমন সরকার দিয়ে ফ্যাসিষ্টদের হাত থেকে দেশ বাঁচানো যায় না। তাই যুদ্ধ বাধবার অল্পকিছু দিনের মধ্যেই ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করলো নাৎসীদের কাছে।

এরপর হিটলার একটার পর একটা দেশ জয় করতে করতে অবশেষে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন অনাক্রমণ চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে অতর্কিতে সোবিয়েতের ওপর হামলা শুরু করলো। আচমকা আক্রান্ত হয়ে গোড়ার দিকে লালফৌজের বেশ কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়—অনেকটা জায়গাজমি হিটলারের কবলে পড়ে। কিন্তু

স্তালিনের অপূর্ব নেতৃত্বে সোবিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে আপন শক্তি সংহত করে প্রাণপাত লড়াই শুরু করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে গড়ে ওঠে তার হিটলার-বিরোধী সংগ্রামের জোট।

বেশ বোঝা গেলো যে এবার যুদ্ধের গতিপথে বেশ একটা বড়ো রকম পরিবর্তন এসেছে। আসলে হিটলার-শাসনের বিরুদ্ধে পদানত দেশের সাধারণ মানুষের সংগ্রাম থেকেই এর সূত্রপাত। কিন্তু বর্বর ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিপ্লবের দুর্গ সোবিয়েত ইউনিয়নের আশ্চর্য প্রতিরোধে ঐ পরিবর্তনের চরম পরিণতি স্পষ্ট ধরা পড়লো। বোঝা গেলো যে এই লড়াইয়ের হারজিতের ওপরেই নির্ভর করছে পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ—তারা ফ্যাসিশমের রসাতলে তলিয়ে যাবে, না সব থেকে হিংস্র সাম্রাজ্যবাদকে খতম করে, পরিষ্কার করবে তাদের ভাবী উন্নতির পথ।

অবস্থা গতিকে হিটলারবিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেও সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে যাতে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত পরাধীন দেশের মানুষের হাতে হাতিয়ার না পড়ে, তারা নিজের ভার যেন নিজের হাতেই না তুলে নেয়। অথচ ফ্যাসিশমকে খতম করার এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কোনো কোনো জায়গায় ঘটনাচক্রে হাতিয়ার এসে পড়লো জনসাধারণের হাতেই। যেমন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যখন জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় তখন ফরাসী, ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও মার্কিন শাসকেরা বিনাযুদ্ধে ভিয়েতনাম, মালয়,

ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন ছেড়ে পালায়। ঐ সব দেশের দেশপ্রেমিকরা তখন কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে হাতিয়ার নিয়ে বনেজঙ্গলে গোরিলা লড়াই শুরু করেন দুর্ধর্ষ জাপানীবাহিনীর বিরুদ্ধে।

আসল লড়াই কিন্তু চললো সোবিয়েতের মাটিতে। লাল-ফৌজ, গোরিলা বাহিনী ও সাধারণ মানুষের মিলিত দেশপ্রেমিক প্রতিরোধের দেওয়ালে সেখানে বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরলো হিট-লারের দুর্ধর্ষবাহিনী। বিশেষ করে ইতিহাসবিখ্যাত স্তালিনগ্রাডের লড়াইয়ের পর থেকে যুদ্ধের মোড় ফিরলো চূড়ান্তভাবে। তারপর হিটলারের কপালে লেখা হতে লাগলো একটানা হারের পর হার। আর যে সাম্রাজ্যবাদীরা সোবিয়েতের চরম দুর্দিনেও 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খুলে তার ওপর জার্মানবাহিনীর চাপ কমাবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি তারা ১৯৪৪ সালের জুন মাসে খুললো সেই ফ্রন্ট।

এরপরে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আর অনিশ্চিত কিছু রইলো না। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত কোয়াএটুং বাহিনীরও বিষদাঁত ভেঙে দেয় লাল ফৌজ। তারপর তার পক্ষে হার মানা ছাড়া আর কোনো পথ রইলো না। এমন সময়, জাপান দিনকয়েকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে জেনেও মার্কিনরা নৃশংসভাবে জাপানের দুটি শহর—হিরোশিমা আর নাগাসাকির ওপরে আণ-বিক বোমা ফেলে। তার ফলে শহরের লক্ষাধিক বাসিন্দা জ্বলে-পুড়ে মারা যায়—পঙ্গুর সংখ্যার তো লেখাজোখাই নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় এ বোমা ফেলার উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি যুদ্ধকে খতম করা নয় কারণ জাপানের পক্ষে আর সম্ভবই ছিলো না যুদ্ধ চালানো।

এর লক্ষ্য ছিলো সোবিয়েতকে ভয় দেখানো—দেখো আমার হাতে কী অস্ত্র রয়েছে! অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই মার্কিনরা এইভাবে তাদের মিত্রশক্তি সোবিয়েতের বিরুদ্ধে শুরু করলো ঠাণ্ডাযুদ্ধ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি।

যাই হোক ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানিও আত্মসমর্পণ করে। ইটালি তারো আগেই পরাস্ত হয়েছিলো মিত্র-সৈন্যবাহিনীর হাতে।

॥ নতুনের প্রসার ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুনে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলো কতো মানুষ, কতো শহর। তার আঁচের ঝলসানিতেই আমাদের বাংলা দেশে শুকিয়ে মরলো ৩৫ লক্ষ নরনারী। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে সব দেশের সাধারণ মানুষের অনেক সব সাবেকি চিন্তাভাবনা বা বিশ্বাসও জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হলো। কারণ যুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেলো যুদ্ধে কারা মরছে আর কারাই বা দুহাতে লুটছে মুনাফা।

তাই ইউরোপের যে দেশগুলি যুদ্ধের আগুনে সব থেকে বেশি জ্বলেছিলো সেখানকার সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে স্থির করেছিলো—'আর সেই পুরোনো আমলে ফিরে যাওয়া নয়। বড়োলোকদের তহবিল ভর্তি করার জন্যে আর তিলেতিলে মরা নয়, দশবিশ বছর পরে পরে আমরা জোয়ানমরদেরা আর তার জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত নই।' এর ফলে রুমানিয়া, বুলগারিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবানিয়া, হাঙ্গেরি ও যুগোশ্লা-

ভিয়াতে দেখতে দেখতে পত্তন হলো নতুন ধরনের সমাজ। এমন কি সাম্রাজ্যবাদীরা যদি সেদিন বাদ না সাধতো তাহলে ফ্রান্স ও ইটালিতেও হয়তো ঐ ব্যাপারই ঘটতো। কারণ সেখানকার বিপুল শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্য সমস্ত সাচ্চা দেশপ্রেমিক দল ও ব্যক্তির সঙ্গে একজোট হয়ে তা গণতান্ত্রিক সরকার গড়েই তুলেছিলো গোড়ার দিকে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের মতো সেখানকার সাধারণ মানুষ শেষপর্যন্ত যে নিজের ভাগ্য নিজেরাই স্থির করতে পারলো না তার একটা কারণ এই যে লাল ফৌজের বদলে সেখানে হাজির ছিলো ইংরেজ ও মার্কিনদের সাম্রাজ্যবাদী বাহিনী।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কিন্তু অনুকূল অবস্থার ফলে সেখানকার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপ পেলো নতুন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ও-সমাজব্যবস্থার মধ্যে। এ ব্যবস্থায় দেশবাসী মাত্রই 'জনসাধারণের কমিটি' মারফত দেশশাসনের দায়িত্ব পালন করে। টাকা ছড়িয়ে বা কারসাজি করে যাতে কেউ রাষ্ট্রকে হাত না করতে পারে তার পাকা ব্যবস্থা থাকে। যে সব ধনিক হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলো সরাসরি বাজেয়াপ্ত করা হলো তাদের সম্পত্তি। আর বড়ো বড়ো বনেদী জমিদারদের জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো বিনামূল্যে। এ সমস্তেরই লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন। এই দিকেই আজ জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।

বুঝতেই পারছো এরই নাম বিপ্লব। কারণ পুরোনো আমলের বনেদী আর ধনিক শাসকদের হাত থেকে এর ফলে দেশশাসনের ভার চলে গেলো জনসাধারণের শক্ত মুঠোয়। তার ফলে

দ্রুতগতিতে বেমালুম বদলে যেতে লাগলো দেশগুলির চেহারা। স্বচ্ছল, শান্তিপূর্ণ, শিক্ষাসংস্কৃতিতে উজ্জল জীবনের সন্ধানে জোর কদমে এগোতে লাগলো এ সব দেশের মানুষ। এ কাজে ডাক পড়লো সবারই। তবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হিসেবে শ্রমিক ও তাদের পার্টিই যে এ সব ব্যাপারে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ালো তা খুবই স্বাভাবিক।

তবে এ কথা ভেবো না যে এতোগুলি দেশে বিপ্লব ঘটে গেলো বেশ নির্বিঘ্নে। মোটেই তা নয়। সাবেক আমলের যে সব বনেদী বড়োলোকদের বিপ্লবের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো তারা প্রথম দিন থেকেই নানাভাবে নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করতে থাকে। আর তাদের চক্রান্তে ইন্ধন জোগায় সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে মার্কিন মুল্লুকের শাসকেরা। অবিশ্রাম কুৎসা প্রচার করে, গুপ্তচর পাঠিয়ে, দেশদ্রোহীদের টাকাকড়ি, এমন কি অস্ত্র-শস্ত্র জুগিয়ে তারাই উঠে পড়ে লাগে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে খতম করতে। রায়াক, কষ্টভ, শ্লানস্কির মতো কিছু কিছু বিশ্বাস-ঘাতক নেতাকে পর্যন্ত তারা জড়িয়ে ফেলে চক্রান্তের জালে। শুধু ঐ সব দেশে নয়, খাস সোবিয়েতেও তারা ঐভাবে চক্রান্ত জাল বিস্তার করে বেরিয়া নামে এক বিশ্বাসঘাতক নেতা মারফত।

কিন্তু এতো করেও একটিমাত্র দেশ ছাড়া আর কোথাও তেমন সুবিধে হলো না সাম্রাজ্যবাদীদের। সরকার আর দেশের সাধারণ মানুষের সতর্কতার দরুন শেষ পর্যন্ত একটার পর একটা ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলো। শাস্তি পেলো দেশদ্রোহীরা। একমাত্র য়ুগোশ্লাভিয়াতে টিটো ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ১৯৪৮ সালে চরম

বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশবাসীর প্রতি। তারা মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শত্রুতা করতে থাকে সোবিয়েত ও গণতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে।

ইউরোপের এতোগুলি দেশে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রসার বড়ো ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মতো এশিয়াবাসীর পক্ষে যে ব্যাপার আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো মহাচীনের রূপান্তর। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর দেশের কিছুটা অঞ্চলে কুওমিনটাং-এর অত্যাচারী ও অপদার্থ শাসন প্রতিষ্ঠা হলেও সারা দেশ আবার আগের মতোই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আবার শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তনায়কদের জুলুম ও শোষণ।

কিন্তু ধনিকরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে না পারলেও সে ব্রতপালনের জন্যে এগিয়ে এলো চীনের শ্রমিক ও তাদের কমিউনিষ্ট পার্টি। চিয়াং কাই-শেকের নিষ্ঠুর অত্যাচারে এদের অনেককেই প্রাণ দিতে হয়। তবু অনেক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও নির্ভীক লড়াই চালাতে চালাতে এরা বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ মাও সে-তুংএর নেতৃত্বে শেষপর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পায় আর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দখল করে সেখানে গড়ে তোলে এক নতুন গণতান্ত্রিক সরকার।

চিয়াং কাই-শেক অবশ্য লক্ষ লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো এই নতুন শক্তিকে খতম করতে। অথচ ঠিক সেই সময়েই জাপানী সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ উত্তর চীনের একটার পর একটা অঞ্চল দখল করছিলো বিনাযুদ্ধে। চীনের কমিউনিষ্ট

পার্টি তাই চিয়াং বাহিনীকে রুখতে রুখতেও সমস্ত দেশবাসীর কাছে বারবার আবেদন জানাতে লাগলো—গৃহযুদ্ধ বন্ধ করুন, আসুন, সবাই মিলে আমরা রুখি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের। এ আবেদনে ক্রমে লোকের চোখ খুলতে থাকে। অবশেষে চিয়াং কাই-শেককেও মেনে নিতে হয় এই দাবি। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে তাকে তোড়জোড় করতে হয় জাপানকে রুখবার।

কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। তলে তলে চিয়াং কাই-শেক সব রকম বিরুদ্ধতা চালাতেই থাকে কমিউনিষ্টদের প্রতি। এমন কি কমিউনিষ্ট ফৌজের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতেও সে পিছপাও হয় না। আর যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই চিয়াং তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কমিউনিষ্টদের ওপরে। মার্কিনরাও চাইছিলো চীনের বিরাট বাজার দখল করতে। তাদের একান্ত অনুগত চিয়াংএর হাতে গোটা দেশটাকে তুলে দিতে পারলেই সে বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। তাই তারা অকাতরে টাকাকড়ি, অস্ত্রশস্ত্র জোগাতে লাগলো চিয়াংএর এই নৃশংস অভিযানে।

কিন্তু তবু এতো করেও শেষরক্ষা হলো না চিয়াং-এর। কারণ চীনের মানুষ তাদের বিশ বছরের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলো কে তার প্রকৃত বন্ধু, কে তার দুশমন আর কার দৌড় কতোদূর। তাই দেখতে দেখতে কোটি কোটি মানুষ এসে দাঁড়াতে লাগলো মাও সে-তুংএর পিছনে। তাদের সমর্থনে গণমুক্তি ফৌজের শক্তি আরো বহুগুণ বেড়ে উঠলো। ১৯৪৯ সালে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে চিয়াংকে সাঙ্গোপাঙ্গসমেত পালাতে হলো

ফরমোজায় আর ঐ বছর অক্টোবর মাসে ষাট কোটি মানুষের উল্লাসের মধ্যে ঘোষণা করা হলো জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

ইউরোপের নতুন রাষ্ট্রগুলির মতো চীনেও সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও মানুষ এতোদিনে তাঁদের দেশকে ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক ও শক্তিশালী করার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে হাত দিলেন। এখানেও রাষ্ট্রচালনার নেতা হলো শ্রমিক শ্রেণী ও তাদের পার্টি। কিন্তু কৃষক, মধ্যবিত্ত এমনকি দেশের ধনিকেরাও কেউই বাদ পড়লো না এ ব্যাপারে। তবে যে সব ধনিক জাপান বা চিয়াংএর সঙ্গে একেবারে হরিহর আত্মা ছিলো তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। পিছিয়ে-পড়া সেকেলে দেশ হিসেবে চীনের অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে কৃষক। স্বাধীনতা সংগ্রামেও তারাই ছিলো সব থেকে বড়ো সংগ্রামী শক্তি। তাই শ্রমিক ও কৃষকের সুদৃঢ় মৈত্রীর ওপরেই এবার গড়ে তোলা হলো নতুন সমাজের ইমারত।

নতুন রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থার ফলে চীনের সব থেকে বেশি মানুষ লাভবান হয়েছে তা হলো জমিদারদের হাত থেকে জমি নিয়ে বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা। তবে জমিদার যদি নিজের হাতে চাষ করতে রাজি থাকে তবে সেই পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে তাকেও। এতোদিন পরে বন্ধ হয়েছে জমিদারদের অফুরন্ত খাঁই। আর কৃষকের কপাল ফিরেছে বলে আজ চীনে নতুন নতুন কলকারখানা বসিয়েও কুল পাওয়া যাচ্ছে না তাদের ক্রমাগত বাড়তি চাহিদার। ষাট কোটি মানুষের দেশ, মহাচীন আজ শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব দিক দিয়েই জোর



নতুন চীনের শোষণমুক্ত কৃষক : যুগ-যুগ ধরে জমিদারের শাসনে-শোষণে যাদের পিঠ নুয়ে পড়েছিলো তারা নিজের দখলে জমি পেয়েছে। তারই আনন্দোল্লাস।

কদমে এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে।

শুধু চীনেই নয়, উত্তর কোরিয়া ও ভিয়েতনামেও আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ। তবে দু জায়গাতেই এখনো জবরদস্তি করে দেশের অর্ধেকটা দখল করে বসে আছে মার্কিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা। শেষ পর্যন্ত যে তাদের তাও ছাড়তে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ অতোটুকু দেশের যে কী শক্তি তা প্রমাণিত হয়েছে এতো অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আশ্চর্য অগ্রগতিতে আর কোরিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে। প্রবলপরাক্রম মার্কিন ও ফরাসী বাহিনী সেখানে চরম বর্বরতা চালিয়েও শেষপর্যন্ত হালে পানি পায় নি। কিম ইল-সেন ও ডাঃ হো চি-মিন-এর দেশপ্রেমিক নেতৃত্বে কোরিয়া ও ভিয়েতমিনের গণফৌজ দস্যুবাহিনীকে বারবার পরাজিত করেছে। পৃথিবীর মানুষও জোর গলায় দাবি তুলেছে: বন্ধ হোক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অগত্যা মার্কিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মেনে নিতে হয়েছে সেই প্রচণ্ড দাবি।

এশিয়া-আফ্রিকার সমস্ত মানুষই আজ নিজেদের ভার নিজেদের হাতে তুলে নিতে উদ্যত। মালয়, ফিলিপাইন থেকে শুরু করে কেনিয়া, মরোক্কো, টিউনিশিয়া, আলজিরিয়া পর্যন্ত-দুই বিরাট মহাদেশ জুড়ে আজ তাই চলেছে স্বাধীনতার দুর্বার সংগ্রাম। সুদূর ব্রিটিশ গায়েনাতেও সেই লড়াইই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। চরম অত্যাচার চালিয়েও ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই তার সামাল দিতে পারছে না।

আমাদের দেশেও যুদ্ধের পরে এই প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়।

নৌবিদ্রোহ বা আই-এন-এ অফিসারদের মুক্তি আন্দোলনের কথা তো তোমরা জানোই। বার্মা, ইন্দোনেশিয়াও বাদ পড়েনি; ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ প্রভুরা এ সব দেশে শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাজ-নৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তবে সে হস্তান্তর ঘটে দেশের বড়ো বড়ো ধনিক-জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই। ফলে সায়েব লাট আর বিদেশী ফৌজ হটানো হলো বটে কিন্তু দেশের ওপর বিদেশী পুঁজিদারদের আধিপত্য একটুও কমলো না। সেকেলে সমাজব্যবস্থারও রদবদল হলো না কিছুই। পিছিয়ে-পড়া দেশ হিসেবে এ সব দেশ আজো বিদেশীদের মুখ চেয়ে রয়েছে যন্ত্রপাতি বা ওস্তাদ কারিগরের আশায়। আমাদের দেশকে আবার সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধিয়ে দু টুকরো করে ফেলে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়। ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঝগড়া জিইয়ে রেখে বজায় রাখার চেষ্টা চলছে ইংরেজদের মাতব্বরি আর মার্কিনরা নানা দিক থেকে চেষ্টা করছে ভারতবর্ষে নাক গলানোর।

তবে এশিয়া বা আফ্রিকার মানুষ যে বিদেশী আধিপত্য বা মান্ধাতার আমলের সমাজব্যবস্থা কোনোটাই আর বরদাস্ত করবে না এ কথা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ ভিত টলে গেছে সাম্রাজ্যবাদের।

॥ যুদ্ধ না শান্তি ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদ যে একটানা বেকায়দা অবস্থায় পড়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা যে আরো বেড়ে

গেলো সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো। কারণ সোবিয়েত ইউনিয়ন তো ছিলোই, এবার তারই পথ ধরে পূর্ব ইউরোপের ছ-ছটা দেশ আর ষাট কোটি মানুষের দেশ মহাচীনও সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে বেরিয়ে গেলো। এরা যে নিজেদের সুখসুবিধের জন্যে খুশিমতো ব্যবস্থা করবে এমন বেয়াড়া ব্যাপার সাম্রাজ্যবাদীরাও কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলো না। তারা তাই দেশদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে, গুপ্তচর পাঠিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে মানুষকে কিনে নিয়ে ক্রমাগত চক্রান্ত করতে লাগলো এদের বিরুদ্ধে। তার ওপরে মার্কিন শাসকদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা এও স্থির করলো যে এদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যও যতোদূর সম্ভব কম করতে হবে।

কিন্তু এর ফল দাঁড়িয়েছে কী? এই যে: সাম্রাজ্যবাদীদের নির্বুদ্ধিতার দরুন তারা সোবিয়েত ও জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির নব্বই কোটি লোকের এক বিরাট বাজার হারিয়েছে। তাদের একঘরে করতে গিয়ে খানিকটা একঘরে হয়েছে নিজেরাই। আর অন্যদিকে ঐ নব্বই কোটি মানুষের মধ্যে লেনদেন অভূতপূর্বভাবে বেড়ে চলেছে। ধনিক সমাজের মুনাফা শিকারের লোভ এ সব দেশে প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় এদের মধ্যে রেশারেশি, হিংসুটেপনা দেখা দেয়নি। যার যা দরকার অন্যেরা খোলা মনে, দরাজ হাতে জুগিয়েছে যথাসাধ্য।

দুনিয়ার বাজারটা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তাই হঠাৎ বিশ্রী রকম ছোটো হয়ে পড়েছে। আর সেই খাটো বহরের বাজার দখলের জন্যে নিজেদের মধ্যেও তাই গুঁতোগুঁতি বেড়ে গেছে

সাংঘাতিক রকম। তার ওপরে আবার আমেরিকা তার বিপুল পুঁজির জোরে এদের সবাইকে হঠিয়ে একাই গ্রাস করতে চাইছে সমস্ত বাজার। সে তাই অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের জমিদারির দিকেও হাত বাড়াতে দ্বিধা করছে না।

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে নিজের দেশের শ্রমিক ও পরাধীন দেশের জনসাধারণের বিরোধ যেমন আগের থেকে ঢের বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে তেমনই আবার তাদের নিজেদের মধ্যেও অবনিবনা আজ পৌঁছেছে চরমে। আর এ সবের ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আশঙ্কা।

এ যুদ্ধ চাইছে সাম্রাজ্যবাদীরাই কারণ আগের চাইতে ছোটো বহরের বাজারে সব চাইতে মোটা মুনাফা লুটবার জন্যে এরা যেমন একদিকে দেশবিদেশে তাদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে তেমনই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতিও চালাচ্ছে অবিশ্রাম—এমন কি সুবিধেমতো যুদ্ধও লাগিয়ে দিচ্ছে এখানে ওখানে। কারণ যুদ্ধ বাধলে বা তার আয়োজন করতে হলে চাই কোটি কোটি টাকার টাকার মালপত্র। সে মালপত্র জোগান দিয়ে মানুষ খুনের ব্যবসায় ফেঁপে উঠছে সাম্রাজ্যবাদীরা।

নতুন সমাজ ও সভ্যতা পত্তন হয়েছে যে সব দেশে সেখানে কিন্তু মুনাফার সর্বনেশে টানে মানুষকে আর তার মনুষ্যত্ব বেচতে হয় না। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী যৌথ মেহনতের জোরে গড়ে তুলছে সুন্দর, সচ্ছল, সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ এক জীবন। কিন্তু তার জন্যে চাই শান্তি, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ করার ফুরসত। তাদের স্বার্থ তাই শান্তিরক্ষার সঙ্গে ঠিক তেমনই ভাবে জড়িত যেমন

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত যুদ্ধের উদ্যোগ।

সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেও আবার এ ব্যাপারে আজ সব থেকে উদ্যোগী হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। তাদের টাকার জোর সব থেকে বেশি। যুদ্ধের ফলে জার্মানি বা জাপানের মতো শত্রুরা যেমন একদিকে ঘায়েল হয়েছে তেমনই আবার ব্রিটেন, ফ্রান্সের মতো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীরাও হয়ে পড়েছে অনেকখানি কাবু। তাই এদের চোটপাটে পৃথিবীর সাধারণ মানুষই যে শুধু অতিষ্ঠ তাই নয়—ব্রিটেন-ফ্রান্সও আজ চোখে সর্ষে ফুল দেখছে এদের দাপটে। মার্কিনরা মুখে বলছে বটে 'সোবিয়েত ইউনিয়ন আর কমিউনিষ্টরাই যতো অনর্থের মূল। তারাই হাঙ্গামা বাধাচ্ছে সারা দুনিয়ায়। তাদের খতম না করলে শান্তি নেই'—কিন্তু হিটলারো তো ঠিক ঐ বুলির আড়ালেই তার কাজ হাঁসিল করেছিলো বহুদিন ধরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সমস্ত দেশ মিলে যে 'জাতিসংঘ' গড়ে তুলেছিলো মার্কিনদের কারসাজিতে আজ তাও ব্যর্থ হতে বসেছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু যে অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমার হাঁক পেড়ে, সারা পৃথিবীতে তার যুদ্ধঘাঁটি গেড়ে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও ইউরোপে যুদ্ধজোট গড়েই ক্ষান্ত থাকছে তাই নয়। কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, কেনিয়ায় তারা সত্য সত্যই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে অবিশ্রাম। তাতে মরছে লক্ষ লক্ষ মানুষ—ধ্বংস হচ্ছে হাজার হাজার গ্রাম ও শহর। এতেও তারা তুষ্ট নয়। তারা এখন চাইছে যুদ্ধের আগুন সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে।

এ কাজ কিন্তু এখন আর অতো সহজ নয়। দুনিয়ার

মানুষ আজ বুঝছে যে বিনাযুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনায়াসে সুখেস্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে—অধিকারী হতে পারে ক্রমশ উন্নতিশীল জীবনযাত্রার। তারা এও জানে যে আধুনিক যুদ্ধ তীরধনুক নিয়ে লড়া হবে না, হবে অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা ফেলে। তারা তাই স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে এ সর্বনাশ ঠেকাতে না পারলে রসাতলে তলিয়ে যাবে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি।

তাই, যুদ্ধ না শান্তি—এ প্রশ্নের একটিমাত্র জবাবই আজ যে কোনো বুদ্ধিমান হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব; বিশেষ করে যারা এশিয়া-আফ্রিকার পরাধীন দেশের মানুষ তাদের পক্ষে তো অন্য উত্তর কল্পনার অতীত। কারণ আজো মালয়, কেনিয়া, আলজিরিয়ার দেশপ্রেমিকদের বুনো জন্তুর মতো বনেজঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীরা। আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমার শিকার হয়েছে এশিয়ারই মানুষ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি আমাদের লক্ষ্য করেই রাখঢাকের কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে বলেছেন—আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে এশিয়াবাসীকে লড়তে হবে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে।

ভারতের তথা এশিয়া-আফ্রিকার মানুষ তাই সমস্ত অন্তর থেকে দাবি করে—বন্ধ হোক এশিয়া-আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ ও জুলুম, খতম হোক তাদের হাজার বছরের পিছিয়ে-পড়া অবস্থা। চীন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেদিন নানা মত ও পথের দেশের পাশাপাশি সভ্যভাবে বসবাস করার যে পাঁচটি



যুদ্ধ নয়—শান্তি !
ঘরে ঘরে প্রাচুর্য আর আনন্দ
শিশুর হাসি আর মায়ের সুখ
শিল্প, সাহিত্য, সৃষ্টির উৎসব

নীতির কথা ঘোষণা করেছেন তারই মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে এশিয়ার তথা পৃথিবীর মানুষের অন্তরের কামনা।

শান্তিরক্ষার ব্যাপারে আমরা আজ একা নই। সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন, সমস্ত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকার ও প্রত্যেকটি মানুষ এ ব্যাপারে অগ্রণী। বিশ্বশান্তি আন্দোলনও দিন দিন প্রবল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে দুনিয়ার আসরে। কোটি কোটি মানুষের এই মিলিত সংগ্রাম নিশ্চয়ই ব্যর্থ করবে সাম্রাজ্য-বাদীদের সমস্ত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।



জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন